PDF Shared By: MyMahbub.Com

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, যুগবিভাগ ও চর্যাপদ

বাংলা ভাষা ও লিপি

বাংলা ভাষার আদি উৎস "ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা"। এর দুটি অংশ। ১) কেন্তুম ও ২) শতম। বাংলা ভষার উৎপত্তি কেন্তুম অংশ থেকে। ড.শহীদুল্লাহ এর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় প্রাকৃত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে। ড.সুনীতিকুমা চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি মাগধী প্রাকৃত থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে। প্রাচীন ভারতীয় লিপি ২ ভাগে বিভক্ত। ১) ব্রাহ্মী লিপি ২) খরোষ্ঠী লিপি। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ব্রাহ্মী লিপি থেকে।

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের অধিক কালের ইতিহাস
এই হাজার বছরের অধিক কালের ইতিহাস কে প্রধানতঃ ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
১. প্রাচীন যুগ, ২. মধ্যযুগ ৩. আধুনিক যুগ

১. প্রাচীন যুগঃ (৬৫০/৯৫০ – ১২০০ খ্রী)
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী – ড:মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ড:মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর
ড:সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ২৫০ বছর।
প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – চর্যাপদ।

অন্ধকার যুগঃ (১২০১-১৩৫০ খ্রী.)
অন্ধকার যুগ এমন একটি যুগ যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি
অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী করা হইছে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী।
তিনি ১২০১ সালে মতান্তরে ১২০৪ সালে হিন্দু সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেন কে পরাজিত করে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে।
অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন না মেললেও সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন মেলে। যেমনঃ
১/ রামাই পন্ডিতের "শূণ্যপুরাণ" ২/ হলায়ুধ মিশ্রের "সেক শুভোদয়া"

মধ্যযুগের বেশ কিছু কাব্যঃ
১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, ২. বৈষ্ণপদাবলী, ৩. মঙ্গলকাব্য, ৪. রোমান্টিক কাব্য
৫. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য, ৬. পুঁথি সাহিত্য, ৭. অনুবাদ সাহিত্য

৮. জীবনী সাহিত্য, ৯. লোকসাহিত্য, ১০. মর্সিয়া সাহিত্য, ১১. করিয়ালা ও শায়ের
১২. ডাক ও খনার বচন, ১৩. নথিসাহিত্য

মধ্যযুগে অন্য সাহিত্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায়ঃ
১. পত্র ২. দলিল দস্তাবেজ, ৩. আইন গ্রন্থের অনুবাদ
তবে এগুলো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

মধ্যযুগে মুসলিম কবিগণ রচনা করেন রোমান্টিক কাব্য
পক্ষান্তরে হিন্দুধর্মাবলী কবিগণ রচনা করেন দেব দেবী নির্ভর আখ্যান / কাহিনী কাব্য।
মধ্যযুগে সতের শতকে বাংলার বাইরে আরাকান রাজসভায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়।
মধ্যযুগে দুটো বিরাম চিহ্ন ছিল
বিজোড় সংখ্যক লাইনের পর এক দাড়ি
জোড় সংখ্যক লাইনের পর দুই দাড়ি

[১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র মারা যাবার পর মধ্যযুগের সমাপ্তি হয় … প্রশ্ন উঠতে পারে ভারত চন্দ্র মারা যাবার সাথে সাথে মধ্যযুগের পতনের কি সম্পর্ক? ভারতচন্দ্র মারা যাবার পর মধ্যযুগের সমাপ্তি হয় কারণ মঙ্গলকাব্যের চারশ বছরের কাব্যধারার সমাপ্তি … কিন্তু এই কারনের সাথে আরও একটা কারণ জড়িত … রাজনৈতিক ভাবেও এই এলাকার পটভূমি পরিবর্তন হতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশির প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার মধ্যদিয়ে ইংরেজ তথা বৃটিশদের শাসন হয় তখন সাহিত্যের আবির্ভাব হয় যা আধুনিক সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করার অন্যতম কারণ]

যুগসন্ধিক্ষণঃ (১৭৬১-১৮৬০ খ্রী.)
যুগসন্ধিক্ষণ মানে দুই যুগের মিলন
যুগ সন্ধিক্ষণ এমন একটি যুগ যে যুগে মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের মিশ্র বৈশিষ্ট পাওয়া যায়।
যুগসন্ধিক্ষণের কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্ববিরোধী কবি ও বলা হয়েছে।

[স্ববিরোধী বলার কারণঃ প্রথমদিকে তিনি ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে লেখলেও শেষের দিকে তার কাব্যে ইংরেজদের শাসনের প্রশংসা করেছেন]

আধুনিক যুগঃ (১৮০১-বর্তমান)
আধুনিক যুগকে দু ভাগে ভাগ করা যায়
১. উন্মেষ পর্ব (১৮০১-১৮৬০ খ্রী.)
২. বিকাশ পর্ব (১৮৬১ – বর্তমান)
গদ্য সাহিত্য হচ্ছে আধুনিক যুগের সৃষ্টি
১. গল্প ২. উপন্যাস ৩. নাটক ৪. প্রহসন ৫. প্রবন্ধ

প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – ব্যাক্তি
মধ্য যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল – ধর্ম
আধুনিক যুগে সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল – মানবিকতা / মানবতাবাদ / মানুষ
সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ / সমাদৃত – ১. কাব্য (গীতিকাব্য), ২. উপন্যাস, ৩. ছোটগল্প

চর্যাপদঃ

বাংলাদেশের আদি সাহিত্য চর্যাপদ যা হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে এবং হাজার বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে।
বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন চর্যাপদ
চর্যাপদ হচ্ছে কবিতা / গানের সংকলন
চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ব
চর্যাপদ হচ্ছে পাল ও সেন আমলে রচিত

চর্যাপদ রচনার প্রেক্ষাপটঃ

১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলালমিত্র কিছু পুঁথি সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal
এই গ্রন্থটি পাঠ করে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হন যার উপাধি মহামহোপধ্যায়
যিনি পরবর্তী কালে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান
তিনি ১৯০৭ সালে ২য় বারের মত নেপাল গমন করেন
নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে ৪ টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন।
এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ
বাকী ৩ টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত
১. সরহপদের দোহা
২. কৃষ্ণপদের দোহা
৩. ডাকার্ণব
উল্লেখিত ৪ টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়
১৯১৬ সালে তখন চারটি গ্রন্থের একসংগের নাম দেওয়া হয় হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা

এটি প্রকাশিত হবার পর পালি সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষাবিদ রা চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবী করেন।
এসব দাবী মিথ্যা প্রমাণ করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
১৯২৬ সালে The Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।
১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মতত্ব বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন।
চর্যাপদের নামকরণঃ
১. আশ্চর্যচর্যচয় ২. চর্যাচর্যাবিনিশ্চয় ৩. চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় ৪. চর্যাগীতিকোষ ৫. চর্যাগীতি
চর্যাপদ মানে আচরণ / সাধনা

চর্যাপদের পদসংখ্যাঃ

মোট ৫১ টি পদ ছিল। ৪৬টি পূর্ণ পদ আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের সময় উপরের পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকার কারোনে সবগুলো পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং পরে একটি পদের অংশবিশেষ সহ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কৃত হয়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যাঃ
চর্যাপদে মোট ২৪জন কবি পাওয়া যায়
১ জন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম – তন্ত্রীপা / তেনতরীপা
সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন

উল্লেখযোগ্যকবি
১. লুইপা ২. কাহ্নপা ৩. ভুসুকপা ৪. সরহপা ৫. শবরীপা ৬. লাড়ীডোম্বীপা ৭. বিরুপা
৮. কুম্বলাম্বরপা ৯. ঢেন্ডনপা ১০. কুক্কুরীপা ১১. কঙ্ককপা

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণঃ
পদ > পাদ > পা
পাদ > পদ > পা
পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য / সাধক [এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন]

২ টি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হতঃ
১. পদ রচনা করতেন
২. সম্মান / গৌরবসূচক কারনে

লুইপাঃ
১. চর্যাপদের আদিকবি
২. রচিত পদের সংখ্যা ২ টি

কাহ্নপাঃ
১. কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩ টি –তিনি সবচেয়ে বেশী পদ রচয়ীতা
২. উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ১২ টি
৩. তার রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি

ভুসুকপাঃ
১. পদসংখ্যার রচনার দিক দিয়ে ২য়
২. রচিত পদের সংখ্যা ৮টি
৩. তিনি নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করেছেন
৪. তার বিখ্যাত কাব্যঃ অপনা মাংসে হরিণা বৈরী অর্থ – হরিণ নিজেই নিজের শত্রু

সরহপাঃ
১. রচিত পদের সংখ্যা ৪ টি

শবরীপাঃ
১. রচিত পদের সংখ্যা ২ টি
২. গবেষকগণ তাকে বাঙ্গালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন

৩. বাংলার অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়। যদি তিনি ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস না করতেন তাহলে বাঙ্গালী কবি হবেন না।

কুক্কুরীপাঃ
১. রচিত পদের সংখ্যা ২ টি
২. তার রচনায় মেয়েলী ভাব থাকার কারণে গবেষকগণ তাকে মহিলা কবি হিসেবে সনাক্ত করেন।

তন্ত্রীপাঃ
১. উনার রচিত পদটি পাওয়া যায় নি।
২. উনার রচিত পদটি ২৫ নং পদ।

ঢেন্ডনপাঃ
চর্যাপদে আছে যে বেদে দলের কথা, ঘাঁটের কথা, মাদল বাজিয়ে বিয়ে করতে যাবার উৎসব, নব বধুর নাকের নথ ও কানের দুল চোরের চুরি করার কথা সর্বোপরি ভাতের অভাবের কথা
ঢেন্ডনপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে। তিনি পেশায় তাঁতি
টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী
হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী

[আবেশী কথাটার ২টি অর্থ রয়েছে
ক্ল্যাসিক অর্থে – উপোস এবং রোমান্টিক অর্থে – বন্ধু]
চর্যাপদের ভাষাঃ
চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত- এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কতিপয় গবেষক চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা মেনে নিয়েই এ ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা / সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা বলেছেন।
অধিকাংশ ছন্দাসিক একমত – চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শনঃ চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।

চর্যাপদ মূলতঃ গানের সংকলন। এর মূল বিষয়বস্তু- বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।

সাধারণতঃ বৌদ্ধ সহজিয়াগণ চর্যাগুলো রচনা করেন ।
চর্যায় কত জন কবির পদ পাওয়া গেছে এ নিয়ে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুডডিস্ট মিস্টিক সংস' গ্রন্থে ২৩ জন কবির নাম আছে। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন। রাহুল সাংকৃতায়ন নেপাল-তিববতে প্রাপ্ত তালপাতার পুথিতে আরো কয়েকজন নতুন কবির চর্যাগীতি পেয়ে 'দোহা-কোষ' (১৯৫৭) গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। সে বিচারে এক কথায় বলা চলে চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩, মতান্তরে ২৪।

কাহ্নপা সর্বাপেক্ষা বেশি পদ রচনা করেন। ১৩টি পদ রচনা করেন। ১২টি পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন-ভুসুকুপা: ৮টি।
তন্ত্রীপা (না পাওয়া পদ নং -২৫) কবি রচিত পদটি পাওয়া যায় নি ।
চর্যাপদে যেসব পদ পাওযা যায় নি-২৪ (কাহ্নপা রচিত), ২৫ (তন্ত্রী পা রচিত), ৪৮ (কুক্কুরীপা রচিত) সংখ্যক।

প্রশ্নঃ চর্যাপদ গ্রন্থে মোট কয়টি পদ পাওয়া গেছে?
উত্তরঃ সাড়ে ছেচল্লিশটি (একটি পদের ছেঁড়া বা খন্ডিত অংশসহ)।

প্রশ্নঃ চর্যার পদগুলো কোন ভাষায় রচিত?
উত্তরঃ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত।

প্রশ্নঃ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা কি?
উত্তরঃ যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায় নি, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো-
আঁধারের মত, সে ভাষাকে পন্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন।

প্রশ্নঃ চর্যাপদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি কার লেখা? তা উল্লেখ কর।
উত্তরঃ লুইপার।

প্রশ্নঃ চর্যাপদের আবিষ্কারক কে?
উত্তরঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রশ্নঃ তিনি কোন উপাধি প্রাপ্ত হন?
উত্তরঃ মহামহোপাধ্যায়।

প্রশ্নঃ কোথায় থেকে, কত সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয়?
উত্তরঃ নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে, ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয়।

প্রশ্নঃ চর্যাপদ কবে, কোথা থেকে, কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে আসে?
উত্তরঃ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে
চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রশ্নঃ চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে কে কি বলেন?
উত্তরঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পদগুলো রচিত। সুকুমার সেন সহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পন্ডিতই সুনীতিকুমারকে সমর্থন করেন।

প্রশ্নঃ চর্যাপদের নাম নিয়ে প্রস্তাবগুলো কি?
উত্তরঃ কারো মতে গ্রন্থটির নাম, 'আশ্চর্য চর্যাচয়', সুকুমার সেনের মতে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়, আধুনিক পন্ডিতদের মতে এর নাম 'চর্যাগীতিকোষ' আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। তবে 'চর্যাপদ' সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাম।

প্রশ্নঃ চর্যার কবিদের মধ্যে কোন কবি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়?
উত্তরঃ শবরপা (৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)।

প্রশ্নঃ চর্যাপদের সর্বাধিক পদরচয়িতা কোন কবি?
উত্তরঃ কাহ্নপা।

প্রশ্নঃ তিনি কয়টি ও কোনপদগুলো রচনা করেন?
উত্তরঃ ১টি। পদগুলোঃ ৭, ৯ থেকে ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ (২৪ নং পদটি কাহ্নপা রচিত, তবে সেটি পাওয়া যায় নি)

প্রশ্নঃ চর্যাপদে যে পদগুলো পাওয়া যায় নি তার কোনটি কাহ্নপার রচনা বলে মনে করা হয়।
উত্তরঃ ২৪ নং পদটি।

প্রশ্নঃ চর্যাপদে কাহ্নপা আর কি কি নাম পাওয়া যায়?
উত্তরঃ কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচর্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ।

প্রশ্নঃ কুক্কুরীপা কি মহিলা কবি ছিলেন?
উত্তরঃ কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে অনেকের মতে কুক্কুরীপা নারী ছিলেন।

প্রশ্নঃ তিনি কয়টি পদ রচনা করেন ও কি কি?
উত্তরঃ ২টি। ২ ও ২০ সংখ্যক। মনে করা হয়, খুঁজে না পাওযা ৪৮ নং পদটিও তাঁর রচনা। সে হিসেবে ৩টি।

প্রশ্নঃ কুক্কুরীপা রচিত অতিপরিচিত দুটি পংক্তি কি?
উত্তরঃ দিবসহি বহূড়ী কাউহি ডর ভাই। রাতি ভইলে কামরু জাই। (পদ:২) (অর্থাৎ দিনে বউটি কাকের ভয়ে ভীত হয় কিন্তু রাত হলেই সে কামরূপ যায়।)

প্রশ্নঃ লুইপা কে ছিলেন?
উত্তরঃ প্রবীণ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের কবি।

প্রশ্নঃ লুইপা কোন অঞ্চলের কবি ছিলেন?
উত্তরঃ তিববতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে লুইপা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে লুইপা রাঢ় অঞ্চলের লোক।

প্রশ্নঃ চর্যাপদের প্রথম পদটি কার রচনা?
উত্তরঃ লুইপার।

প্রশ্নঃ এই পদের দুটি চরণ লিখ।
উত্তরঃ কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল\ (পদ: ১) (অর্থাৎ দেহ গাছের মত, এর পাঁচটি ডাল। চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে।)

প্রশ্নঃ চর্যায় তিনি মোট কতটি পদ লিখেছেন?
উত্তরঃ দুটি (১ ও ২৯) সংখ্যক)

প্রশ্নঃ লুইপা রচিত কয়টি সংস্কৃতগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, কি কি?
উত্তরঃ ৫টি। অভিসময় বিভঙ্গ, বজ্রস্বত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদাভসার, তত্ব সভাব।

প্রশ্নঃ শবরপা কোন সময়ের কবি?
উত্তরঃ তার জীবনকাল ৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সেই সূত্রে শবরপা চর্যার কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

প্রশ্নঃ শবরপা কোন দেশের লোক ছিলেন?
উত্তরঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি ‘বাংলা দেশে’র লোক।

প্রশ্নঃ শবরপা কোন কবির গুরু ছিলেন?
উত্তরঃ লুইপার।

প্রশ্নঃ চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?
উত্তরঃ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

প্রশ্নঃতিনি কার শিষ্য ছিলেন?
উত্তরঃ নাগার্জুনের।

প্রশ্নঃ সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলে তিনি কয়টি গ্রন্থ লিখেছেন।
উত্তরঃ ১৬টি।

প্রশ্নঃ চর্যাপদের কোন পদগুলো তার রচনা?
উত্তরঃ ২৮ ও ৫০ সংখ্যক।

প্রশ্নঃ ‘চর্যাপদ’ কোন ধরণের ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
উত্তরঃ সহজিয়া বৌদ্ধ

চর্যাপদের ৭জন বাঙ্গালি কবির নাম মনে রাখার সূত্রঃ
((কুকুর বিড়াল জনন্দির ডোবার ধারে সবুর লয়।))

কুকুর = কুক্কুড়ীপা
বিড়াল = বিরুআপা
জনন্দির = জঅনন্দি
ডোবার = ডোম্বীপা
ধারে = ধামপা
সবুর = শবরপা
লয় = লুইপা

চর্যাপদ কী, কেন এবং আমাদের ইতিহাসে এর গুরুত্ব (একটি জেনারেলাইজড আলোচন

[এই পোস্টে **চর্যাপদ** নিয়ে কোন জ্ঞানগভীর আলোচনা করবো না, একটা **জেনারেলাইজড আলোচনা** করব, যাতে চর্যাপদ নিয়ে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। পড়লে অন্তত চর্যাপদ নিয়ে বেসিক একটা নলেজ পাওয়া যাবে। যারা চর্যাপদ নিয়ে ব্যাপক পড়ালেখা করতে চান, তাদের জন্য নিচে কিছু **রেফারেন্স বইয়ের নাম** দিয়ে দিলাম।]

চর্যাপদ কী, বা এটাতে কী আছে, সেটা সবাই একরকম জানে। তবু শুরুতে চর্যাপদের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে কারো কোন কনফিউশন থাকলে সেটা দূর হয়। বলছি না, চর্যাপদ নিয়ে যে তথ্যগুলো দিচ্ছি সেগুলোই সঠিক, তবে যেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য, সেগুলোই দেয়ার চেষ্টা করবোচর্যাপদ নিয়ে প্রথম এবং চরমতম কথা হল, এটা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম, এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের এই একটাই নিদর্শন পাওয়া গেছে; তবে তার মানে এই নয়, সে যুগে বাংলায় আর কিছু লেখা হয়নি। হয়তো লেখা হয়েছিল, কিন্তু সংরক্ষিত হয়নি। সে নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। আপাতত চর্যাপদ সম্পর্কিত কিছু বেসিক তথ্য দেয়া যাক।চর্যাপদ রচিত হয় ৮ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে। এ নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে, তবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মত এটাই। এটি মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের সাধন সঙ্গীত।বইটিতে মোট চর্যা বা পদ বা গান আছে ৫১টি। এরমধ্যে ১টি পদের টীকা বা ব্যাখ্যা দেয়া নেই। ৫১টি পদের মধ্যে পাওয়া গেছে সাড়ে ৪৬টি; একটি পদের অর্ধেক পাওয়া গেছে। চর্যাপদের মোট কবি ২৩ জন। এ নিয়েও বিতর্ক আছে; যেমন অনেকেই বলেন দারিক পা আর দাড়িম্ব পা আলাদা ব্যক্তি, কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত হল, এই দুইজন একই ব্যক্তি। এভাবে একেকজনের গণনায় কবির সংখ্যা একেকরকম; তবে গ্রহণযোগ্য মত ২৩ জন।চর্যাপদের প্রাচীনতম কবি সরহ পা। অনেকে দাবি করেন, লুই পা সবচেয়ে পুরোনো; তাদের এই ধারণার পক্ষে প্রমাণ, চর্যার প্রথম পদটি তার রচিত, এই প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে আদিকবি'ও বলা হয়। কিন্তু পরে এটা প্রমাণিত হয়েছে, চর্যাপদের কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম কবি সরহ পা-ই। আর সবচেয়ে বেশি পদ লিখেছেন কাহ্নু পা,

১৩টি। সরহ পা লিখেছেন ৪টি পদ। ভুসুক পা লিখেছেন ৮টি, কুক্কুরী পা ৩টি, লুই পা, শান্তি পা আর সবর পা ২টি করে। বাকি সবাই ১টি করে পদ লিখেছেন।চর্যাপদ নিয়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিতর্ক হল, এটি কোন ভাষায় রচিত। এটা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, এবং এই বিতর্কের কোন শেষ হবে বলে ভাবারও কোন অবকাশ নেই। আমরা যেমন দাবি করি এর ভাষা বাংলা, তেমনি অসমিয়ারাও দাবি করে এর ভাষা অসমিয়া, মৈথিলিরাও দাবি করে এর ভাষা মৈথিলি, উড়িয়ারাও দাবি করে এর ভাষা উড়িয়া। এমনি দাবি করে মগহি, ভোজপুরিয়া আর নেওয়ারিরাও। কেবল হিন্দিভাষীদের দাবিই উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।বুঝতে হলে এই অঞ্চলের ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকা দরকার। এই লেখায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি না, সেটি ভিন্ন আলোচনা; কেবল এই তথ্যটা জানা জরুরি, তখনো বাংলা ভাষা পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠেনি, বরং স্বতন্ত্র একটি ভাষা হয়ে উঠছে। এর কেবলই কিছু আগে বাংলা ভাষা থেকে আলাদা হয়েছে উড়িয়া ভাষা। তখনো মৈথিলি আর অসমিয়া বাংলা থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠেনি; মৈথিলি পুরোপুরি আলাদা হয়েছে তের শতকে, অসমিয়া আলাদা হয়েছে ষোল শতকে। (ভাষা আলাদা হওয়ার ব্যাপারটা বোঝানো একটু কষ্টকর, এখানে তাই জটিলতাটুকু পরিহার করলাম) এই অঞ্চলের অন্যান্য ভাষাগুলোও বাংলা থেকে পুরোপুরি পৃথক হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি; ফলে চর্যার ভাষায় এই সব ভাষারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর উড়িয়া, মৈথিলি আর অসমিয়া, বিশেষ করে শেষ দুটি ভাষার বৈশিষ্ট্য চর্যাপদে বেশ ভালভাবেই বিদ্যমান। ফলে চর্যাপদের উপর এই ভাষাগুলোর দাবি কোনভাবেই নস্যাৎ করে দেয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই, চর্যাপদ আমাদেরও সম্পদ।চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে বেশ ভাল একটা উপসংহার টেনেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; তিনি এর ভাষার নাম দিয়েছেন বঙ্গ-কামরুপী, বা প্রত্ন-বাংলা-আসামি-উড়িয়া-মৈথিলি ভাষা। প্রসঙ্গ গেল, এখন আলোচনা করা যাক চর্যাপদ রচনার কারণ কী। এটা আগেই বলা হয়েছে, চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধ সহজিয়াদের বা তান্ত্রিকদের সাধন সঙ্গীত। কিন্তু এই বৌদ্ধ সহজিয়া কারা? সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাসের বা ধর্মের ইতিহাস একটু হলেও আলোচনা করতেই হবে। এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের নিজস্ব ধর্ম বা বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসে প্রথম পরিবর্তন আসে আর্যদের আগমনের ফলে। কিন্তু তখনো বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়নি। বাংলা ভাষার উদ্ভবের অনেক আগেই বুদ্ধ এসেছেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। এই অঞ্চলের মানুষ তখন ছিল মূলত বৌদ্ধ। কিন্তু নতুন ধর্ম কখনোই পুরোনো ধর্মের প্রভাব এড়াতে পারে না, বৌদ্ধ ধর্মও পারেনি। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন রকম হয়ে পড়ে। তখনকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদেরকে মোটমাট ১০টি শাখায় বিভক্ত করা হয়, এই শাখাগুলোকে বলা হয় যান। মোটা দাগে ধরলে, শাখা ছিল দুটি- মহাযান ও হীনযান বা সহজযান। মহাযানীরা ছিল মূলত চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার

অধিবাসী; আর আমাদের উপমহাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ছিল মূলত হীনযানী বা সহজযানী। এই ধারার বৌদ্ধ সাধকরাই আমাদের আলোচ্য সহজিয়া সাধক বা সহজিয়া তান্ত্রিক। এই সহজিয়া তান্ত্রিকদের নিজস্ব সাধন সঙ্গীত ছিল, যেগুলোতে গুরুরা তাদের তন্ত্রসাধনার মন্ত্র গোপনে বেঁধে রাখতেন। কেবল যারা তান্ত্রিক সাধনা করে, তারাই সেই মন্ত্র বুঝতে পারবে, অন্যদের কাছে সেটা সাধারণ গানের মতোই অর্থবহ মনে হবে। এইরকম গানেরই উদাহরণ আমাদের চর্যাপদের পদগুলো। গানগুলোর দুটো অর্থ থাকে, একটি সবাই বুঝলেও আসল যে অর্থ, তান্ত্রিক সাধনার গোপন মন্ত্র, সেটা তান্ত্রিকরা ছাড়া অন্যেদের পক্ষে বোঝা মুশকিল; অন্তত বুঝতে হলে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। অর্থের এরকম দুর্বোধ্যতা, বোঝা গিয়েও বুঝতে না পারার কারণে এর ভাষাকে বলা হয়েছে সন্ধ্যা ভাষা বা সন্ধা ভাষা। অনেকে একে বলেছেন আলো-আঁধারির ভাষা। এইরকম আরো গানের দেখা পাওয়া যায় নেপালে তিব্বতে। কেন এই গানগুলো আমাদের অঞ্চলে নেই, আর নেপালে তিব্বতে এই ধারার গান এখনো টিকে আছে (এই ধারার গান সেখানে বজ্রা গান নামে পরিচিত), তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।শতকের শেষে বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের পতন হয় সেনদের হাতে। মানে, বৌদ্ধরাজের পতন হয়, হিন্দুরাজ শুরু হয়। ফলে স্বভাবতই, দেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিধর্মী সম্রাটের প্রতি ভয় কাজ করে। আর মধ্যযুগে (আধুনিক যুগেও নয় কী?) স্বভাবতই রাজধর্মের বেশ প্রভাব ছিল। ফলে অপেক্ষাকৃত ধনী বৌদ্ধরা চলে যায় উত্তরে, নেপাল ভূটান তিব্বতে। আর যাদের সেই সামর্থ্য নেই, তাদের বড়ো অংশই হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। এদের একটা বড়ো অংশই পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ফলে ঐ বৌদ্ধদের সাথে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের গানগুলোও চলে যায় নেপালে তিব্বতে। সেখানে যে আগে এই গানগুলোর চর্চা ছিল না, তা নয়; তবে বৌদ্ধদের মূল শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এই অঞ্চলেই, এখানকার বৌদ্ধবিহারগুলো। কিন্তু এই পালাবদলের পর এই ধারার গানগুলোর বাহন ভাষারও পরিবর্তন ঘটল; এই অঞ্চলের ভাষায় এ ধারার গান রচনা বা গীত হওয়াও বন্ধ হয়ে গেল; এ ধারার গানের বাহন হয়ে উঠল মূলত তিব্বতি ভাষা।এই একই কারণে চর্যাপদের পুঁথিটি পাওয়া গেছে নেপালে, বাংলায় বা বাংলার আশেপাশে নয়। এবং একই কারণে বাংলায় এ ধরনের আর কোন পুঁথিও পাওয়া যায়নি, হয়তো সেগুলোও নেপালে তিব্বতে চলে গিয়েছিল, সেখানে কেউ সেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি।আরেকটি তথ্য, চর্যাপদের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে ছিল সাড়ে ৪৬টি পদ, কিন্তু আমরা জানি, চর্যাপদের মোট পদ ৫১টি। এমনকি একটি পদ টীকা না করা, সেটিও জানি। কিন্তু কীভাবে?এসব তথ্য জানা গেছে চর্যাপদেরই তিব্বতি সংস্করণের মাধ্যমে। সেখান থেকেই জানা গেছে টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। তিনি সম্ভবত প্রচলিত চর্যাগান গুলো থেকে এই ৫১টি গান বা পদ বাছাই করেছিলেন। এবং সেগুলোর টীকাও করেছিলেন। টীকা করার সময় একটি পদের টীকা করার

প্রয়োজন বোধ করেননি।আশা করি, উপরের আলোচনায় চর্যাপদ কী, কেন রচতি হয়েছিল, এবং আমাদের ইতিহাসে এর যে গুরুত্ব আছে- এ সকল ব্যাপার কিছুটা হলেও পরিস্কার হয়েছে। অন্যথায় কমেন্ট করার অপশন তো থাকছেই।[পোস্টটি ইতিমধ্যেই অনেক বড়ো হয়ে গেছে, আর বড়ো করতে চাচ্ছি না। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আরেকটি পোস্ট আসতে পারে। তবে প্রতিশ্রুতিমতো শেষে রেফারেন্স বইয়ের একটি তালিকা দিয়ে দিচ্ছি।]বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য (প্রথম খণ্ড); আহমদ শরীফবৌদ্ধধর্মও চর্যাগীতি; শশিভূষণ দাশগুপ্তচর্যাগীতি; তারাপদ মুখোপাধ্যাপ্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়; সুখময় মুখোপাধ্যায়
বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চর্যাগীতি

চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বাঞ্চলীয় উপশাখার (পূর্বাঞ্চলীয় আর্য ভাষা) অন্তর্গত, বাংলা-অহমিয়া ভাষা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা হিসেব বিবেচিত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাকৃতজনের ভাষার সাথে আর্যদের ভাষা মিশ্রিত হয়ে বাংলা স্বতন্ত্র ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করার সময়, বাংলা ভাষার আদি রূপ ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করছিল, তারই একমাত্র নমুনা হিসেবে চর্যাগীতিকে আদর্শ বিবেচনা করা হয়। এই ভাষার কাঠামো চের্যাগীতির আদলে প্রকাশ পেয়েছিল খ্রিষ্টীয় ৫০০-৬০০ অব্দের দিকে।
১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটির নাম ছিল- *Sanskrit Buddhist Literature in Nepal*। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (২৬.৭.১৮৯১) মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা অঞ্চলের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র উপর। এই সূত্রে তিনি ১৯০৭ সালে নেপালে যান (তৃতীয় অনুসন্ধান-ভ্রমণ)। এই ভ্রমণের সময় তিনি নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে কিছু নতুন পুথির সন্ধান পান। এই পুথিগুলোসহ *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*- নামেএকটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ)। এই সংকলনের একটি গ্রন্থ ছিল *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চিয়*।

গ্রন্থনাম : ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নেপালে প্রাপ্ত তালপাতার পুথি সম্পর্কে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকার নাম ছিলো- *A Catalogue of Palm Leaf and selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal*। এর দ্বিতীয় খণ্ডের তালিকায় এই পুথির নাম হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন -*চর্য্যাচর্য্যটীকা*। এই নামটি পুথির মলাটে লিখা ছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*- নামক গ্রন্থের

ভূমিকায় এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন-*চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*। কেন তিনি গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করেছিলেন তার ব্যাখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেন নি।

পুথির বন্দনা শ্লোকে আছে-
'শ্রীলূয়ীচরণাদিতিসিদ্ধরচিতেহপ্যাশ্চর্য্যাচেয়সদ্বার্ত্মাবগমায়নির্মলগিরাং.....। এই শ্লোকে উল্লিখিত 'আশ্চার্য্যচর্য্যাচয়' শব্দটিকে এই গ্রন্থের নাম হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রবোধকুমার বাগচী এবং সুকুমার সেন এর যথার্থ নাম হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন- *চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চিয়*। এই গ্রন্থের মনুদত্তের তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণে এই পুথির নাম*চর্যাগীতিকোষবৃত্তি* নামকরণের প্রস্তাব করেছেন। নামকরণের এই বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে এই পুথি সাধারণভাবে চর্যাগীতি বা চর্যাগীতিকা নামেই পরিচিত।

রচনাকাল : বিভিন্ন গবেষকগণ এই পুথির পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছু মত দেওয়া হলো। যেমন–

- **সুনীতি চট্টোপাধ্যায় :** খ্রিষ্টীয় ৯০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে রচিত "চর্য্যাপদ" নামে পরিচিত কতকগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানে আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। [*ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। রূপা। বৈশাখ ১৩৯৬]

- **সুকুমার সেন :** বাঙ্গালা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হইতে মধ্য-চতুর্দশ শতাব্দ (৯০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক বইটির প্রথম গ্রন্থ "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" অংশে সঙ্কলিত চর্যাগীতিগুলি আদি স্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইলেও এগুলির ভাষা খাঁটি আদি স্তরের বাঙ্গালা নহে। [*ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। নভেম্বর ১৯৯৪]

- **ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ :** আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। নাথ-গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধযুগে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই। আমরা বৌদ্ধযুগের একটি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। ইহার নাম আশ্চর্যচর্যাচয়। [*বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স। জুলাই ১৯৯৮]

চর্যাগীতির পদসংখ্যা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে পূর্ণাঙ্গ পদ পাওয়া গেছে ৪৬টি। এই গ্রন্থের ২৩ সংখ্যক পদের অর্ধাংশ পাওয়া গিয়েছিল। বাকি ৩টি পদ (২৪, ২৫ ও ৪৮) ছিল না। ২৩ সংখ্যক পদের

শেষাংশ এবং না-পাওয়া ৩টি পদ তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রবোধকুমার বাগচী। সব মিলিয়ে চর্যাগীতির পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টি।

চর্যাগীতির পদকর্তাগণ

এই পদগুলো রচনা করেছিলেন মোট ২৪ জন সিদ্ধাচার্য। এঁরা হলেন: লুইপাদানাম, কুক্কুরীপাদানাম, বিরুবাপাদানাম্, গুন্ডরীপাদানাম্,চাটিল্লপাদানাম্, ভুসূকুপাদানাম্, কাহ্নপাদানাম্, কম্বলাম্বরপাদানাম্, ডোম্বীপাদানাম, শান্তিপাদানাম্, মহিত্তাপাদানাম্, বীণাপাদানাম্ ,সরহপাদানাম্, শবরপাদানাম্, আর্যদেবপাদানাম্ , ঢেন্ঢণপাদানাম্, দারিকপাদানাম্, ভাদেপাদানাম্, তাড়কপাদানাম্, কঙ্কনাপাদানাম্,জয়নন্দীপাদানাম্, ধর্ম্মাপাদানাম্, তান্তী পা, লাড়ীডোম্বী। এঁদের মধ্যে লাড়ীডোম্বীর পদটি পাওয়া যায়নি। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকলেও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদে এগুলির রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়েছে যথাক্রমে কাহ্ন, তান্তী পা ও কুক্কুরী।

অধিকাংশ গবেষক চর্যা-পদকর্তাদের ভিতরে লুইপাদানামকে আদিসিদ্ধাচার্য হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন আদিসিদ্ধাচার্য হিসাবে সরহপাদ-কে বিবেচনা করেছেন। ইনি ঠিক কোন সময়ের কবি ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ১ ও ২৯ সংখ্যক পদদুটি তাঁর রচিত।

চর্যার পুঁথিতে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কাহ্নপাদানাম্। তিনি কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবজ্র নামেও পরিচিত। পুঁথিতে তাঁর মোট ১১টি পদ (৭, ৯, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫) পাওয়া যায়। ভুসূকুপাদানাম্ রচিত পদের সংখ্যা আটটি (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯)।এছাড়া সরহপাদানাম্-এর চারটি পদ (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯), কুক্কুরীপাদানাম-এর তিনটি পদ (২, ২০, ৪৮), শান্তিপাদানাম্-এর ২টি পদ (১৫ ও ২৬), শবরপাদানাম্-এর দুইটি পদ (২৮ ও ৫০) রচনা করেন। এ ছাড়া একটি করে পদ রচনা করেন বিরুবাপাদানাম্ (৩), গুন্ডরীপাদানাম্ (৪), চাটিল্লপাদানাম্ (৫), কম্বলাম্বরপাদানাম্ (৮), ডোম্বীপাদানাম(পদ ১৪), মহিত্তাপাদানাম্ (১৬), বীণাপাদানাম্ (১৭), আর্যদেবপাদানাম্ (৩১), ঢেন্ঢণপাদানাম্ (৩৩), রিকপাদানাম্ (৩৪), ভাদেপাদানাম্ (৩৫), তাড়কপাদানাম্ (৩৭), কঙ্কনাপাদানাম্ (৪৪), জয়নন্দীপাদানাম্(৪৬), ধর্ম্মাপাদানাম্ (পদ ৪৭) ও তান্তী পা (২৫, মূল বিলুপ্ত)। নাড়ীডোম্বীপাদের পদটি পাওয়া যায় না।

চর্যাগীতির ভাষা

চর্যাপদের সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার পর এর ভাষা নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাবাষীরা তাদের নিজ ভাষার প্রাচীনতম নমুনা হিসেবে দাবি করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোহা* গ্রন্থের ভূমিকায় চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং ডাকার্ণব-কে সম্পূর্ণ প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে দাবি করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভও তাঁর দাবিকে সমর্থন করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাগীতিকে বাংলার প্রাচীন নমুনা হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করে– তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে, এইগুলিকেই প্রাচীন বাংলার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় *Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha* গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মত গ্রহণ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বা অন্যান্য ভাষার বিদ্বজ্জনেরা যাঁরা চর্যাকে নিজ নিজ ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে দাবি করেছিলেন, তাঁরা এই রকম সুস্পষ্ট ও সুসংহত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি।

সন্ধ্যাভাষা

চর্যাপদগুলোর ভিতরে রয়েছে নানা ধরনের দুর্বোধ্য ভাব। এর আক্ষরিক অর্থের সাথে ভাবগত অর্থের ব্যাপক ব্যবধান আছে। ফলে এই পদগুলোতে বুঝা-না-বুঝার দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেই কারণে চর্যায় ব্যবহৃত ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা। তাঁর মতে-

'সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিকটা বুঝা যায় না। অর্থাৎ, এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'

বজ্রযানী ও সহজযানী গ্রন্থকাররাও একে 'সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্' বলে এক রহস্যের ইঙ্গিত দিতেন। বজ্রযানী গ্রন্থগুলিতে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। তিব্বতি ভাষায় 'সন্ধ্যাভাষা'র অর্থ 'প্রহেলিকাচ্ছলে উক্ত দুরুহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা'। ম্যাক্সমুলার 'সন্ধ্যা'র অর্থ করেছিলেন 'প্রচ্ছন্ন উক্তি' (hidden saying)।

চর্যাগীতির সাঙ্গিতিক বৈশিষ্ট্য

চর্যাপদগুলো একাধিক চরণবিশিষ্ট, অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা এবং সুরসঙ্গের বিচারে গীত। চর্যারপদগুলিতে রাগনামের উল্লেখ রয়েছে। রাগনাম থেকেই সহজেই বলা যায়, এগুলো সুরসহযোগে পরিবেশিত হতো। নিচে রাগানুসারে গানগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।

- **পটমঞ্জরী :** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই রাগের গান সংখ্যা ১১টি গান। তাতে ৪৮ সংখ্যক গানটি ছিল না। তিব্বতী অনুবাদ অনুসার ৪৮ সংখ্যক গানটির শিরোনামে 'পটমঞ্জরী' রাগের নাম পাওয়া যায়। এই হিসাবে এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি। এই গানগুলো হলো– ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ ও ৪৮।

- **মল্লারী :** এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৫টি। এই গানগুলো হলো– ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫ ও ৪৯।
- **ভৈরবী :** এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৪টি। এই গানগুলো হলো–১২, ১৬, ১৯ ও ৩৮।
- **কামোদ :** এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৪টি। এই গানগুলো হলো– ১৩, ২৭, ৩৭ ও ৪২।
- **বরাড়ী :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে বলাড্ডী ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৩টি। এই গানগুলো হলো– ২১, ২৩, ২৮ ও ৩৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই ২৩ সংখ্যক গানের শেষাংশ ছিল না।
- **গুঞ্জরী :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে গুর্জরী বা কাহ্ন-গুর্জরী ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৪টি। এই গানগুলো হলো– ৫, ২২, ৪১ ও ৪৭।
- **গৌড় :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে গবড়া বা গউড়া উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৩টি। এই গানগুলো হলো– ২, ৩, ১৮।
- **দেশাখ :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে দ্বেশাখ উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো– ১০ ও ৩২।
- **রামকেলি** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে রামক্রী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো– ১৫ ও ৫০।
- **আশাবরী** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে শিবরী বা শবরী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো– ২৬ ও ৪৬।
- **মালসী** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে মালসী গবুড়া উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো–৩৯ ও ৪০।
- **অরু**: এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ৪
- **দেবগিরি** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে দেবক্রী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ৮
- **ধানশী** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে ধনসী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ১৪।
- **বঙ্গাল** : এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ৩৩।

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই ২৩ সংখ্যক গানের শেষাংশ ছিল না। তিব্বতী নমুনা থেকে এই পদের রচয়িতা হিসেবে তান্তীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে রাগের নাম নেই। একইভাবে

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই ২৪ সংখ্যক গান ছিল না। তিব্বতী নমুনায় এই

রাগের সাথে ইন্দ্রতাল উল্লেখ আছে। সুকুমার সেন এই রাগটিকে 'তাল' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উপরের তালিকা অনুসারে- চর্যাপদগুলোরে সাথে মোট ১৫টি রাগের নাম পাওয়া যায়।

সূত্র :

- *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২৩
- *চর্যাগীতি পদাবলী*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫
- *Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Charyapadas* (A comparative study of the text and the Tibetan translation), Part I, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, Journal of the Department of Letters, Vol. XXX, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮
- *Development of the Bengali Language* .Suniti Kumar Chatterji. London. George Allen & Unwin Ltd, 1970
- *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মাওলা ব্রাদ্রাস। ঢাকা। জুলাই ১৯৯৮।
- *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা। কলকাতা ২০০১।
- *চর্যাগীতিকা*। সম্পাদনায় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা। স্টুডেন্ট ওয়েজ। অগ্রহায়ণ ১৪০২।
- *চর্যাগীতি পাঠ*। ড. মাহবুবুল হক। পাঞ্জেরী পাবলিকেশান লি.। ঢাকা। জুলাই ২০০৯।
- চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ সংস্করণ। জানুয়ারি ২০০৫।
- চর্যাগীতিকোষ। নীলরতন সেন সম্পাদিত। সাহিত্যলোক। কলকাতা। জানুয়ারি ২০০১।

চর্যাপদ- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন ♠

চর্যাপদ বা **চর্যাগীতি** নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বাঞ্চলীয় উপশাখার (পূর্বাঞ্চলীয় আর্য ভাষা) অন্তর্গত, বাংলা-অহমিয়া ভাষাগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা হিসেব বিবেচিত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটির নাম ছিল- Sanskrit Buddhist Literature in Nepal। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (২৬.৭.১৮৯১) মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা অঞ্চলের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা

চেয়ারম্যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)'র উপর। এই সূত্রে তিনি ১৯০৭ সালে নেপালে যান (তৃতীয় অনুসন্ধান-ভ্রমণ)। এই ভ্রমণের সময় তিনি নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে কিছু নতুন পুথির সন্ধান পান। এই পুথিগুলোসহ *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা-* নামেএকটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)। এই সংকলনের একটি গ্রন্থ ছিল *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়*।

গ্রন্থনাম

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নেপালে প্রাপ্ত তালপাতার পুথি সম্পর্কে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকার নাম ছিলো- *A Catalogue of Palm Leaf and selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal*। এর দ্বিতীয় খণ্ডের তালিকায় এই পুথির নাম হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন -*চর্য্যাচর্য্যটীকা*। এই নামটি পুথির মলাটে লিখা ছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা-* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন- *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়।* কেন তিনি গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করেছিলেন তার ব্যাখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেন নি।

এই পুথির বন্দনা শ্লোকে

আছে'শ্রীলূয়ীচরণাদিতিসিদ্ধরচিতেহ *প্যাশ্চর্য্যাচেয়*সদ্বার্ত্মাবগমায়নির্মলগিরাং.....। এই শ্লোকে উল্লিখিত *'আশ্চার্য্যচর্য্যাচয়'* শব্দটিকে এই গ্রন্থের নাম হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রবোধকুমার বাগচী এবং সুকুমার সেন এর যথার্থ নাম হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন- *চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চিয়*। এই গ্রন্থের মনুদত্তের তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণে এই পুথির নাম *চর্যাগীতিকোষবৃত্তি* নামকরণের প্রস্তাব করেছেন। নামকরণের এই বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে এই পুথি *চর্যাপদ* বা *চর্যাগীতি* নামেই পরিচিত।

রচনাকাল

বিভিন্ন গবেষকগণ এই পুথির পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছু মত দেওয়া হলো। যেমন–

- **সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ঃ** খ্রিষ্টীয় ৯০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে রচিত *"চর্য্যাপদ"* নামে পরিচিত কতকগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানে আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই।

[*ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রূপা।বৈশাখ* ১৩৯৬]

- **সুকুমার সেনঃ** বাঙ্গালা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হইতে মধ্য-চতুর্দশ শতাব্দ (৯০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত *'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা'* নামক বইটির প্রথম গ্রন্থ *"চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"* অংশে সঙ্কলিত চর্যাগীতিগুলি আদি স্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইলেও এগুলির ভাষা খাঁটি

আদি স্তরের বাঙ্গালা নহে। [*ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। নভেম্বর ১৯৯৪*]

● **ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহঃ** আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। নাথ-গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধযুগে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই। আমরা বৌদ্ধযুগের একটি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। ইহার নাম *আশ্চর্যচর্যাচয়*। [বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। মাওলা ব্রাদার্স। জুলাই ১৯৯৮]

চর্যাগীতির ভাষা

চর্যাপদের সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার পর এর ভাষা নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাবাষীরা তাদের নিজ ভাষার প্রাচীনতম নমুনা হিসেবে দাবি করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোহা* গ্রন্থের ভূমিকায় *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা* এবং *ডাকার্ণব*-কে সম্পূর্ণ প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে দাবি করেছেন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভও তাঁর দাবিকে সমর্থন করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাগীতিকে বাংলার প্রাচীন নমুনা হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করে– তাঁর *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে, এইগুলিকেই প্রাচীন বাংলার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় *Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha* গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মত গ্রহণ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বা অন্যান্য ভাষার বিদ্বজ্জনেরা যাঁরা চর্যাকে নিজ নিজ ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে দাবি করেছিলেন, তাঁরা এই রকম সুস্পষ্ট ও সুসংহত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি।

সন্ধ্যাভাষা

চর্যাপদগুলোর ভিতরে রয়েছে নানা ধরনের দুর্বোধ্য ভাব। এর আক্ষরিক অর্থের সাথে ভাবগত অর্থের ব্যাপক ব্যবধান আছে। ফলে এই পদগুলোতে বুঝা-না-বুঝার দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেই কারণে চর্যায় ব্যবহৃত ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা। তাঁর মতে- *সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিকটা বুঝা যায় না। অর্থাৎ, এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা*

সাধনভজন করেন তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।' বজ্রযানী ও সহজযানী গ্রন্থকাররাও একে *'সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্'* বলে এক রহস্যের ইঙ্গিত দিতেন। বজ্রযানী গ্রন্থগুলিতে *'সন্ধ্যাভাষা'* শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। তিব্বতি ভাষায় *'সন্ধ্যাভাষা'*র অর্থ *'প্রহেলিকাচ্ছলে উক্ত দুরুহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা'*। ম্যাক্সমুলার *'সন্ধ্যা'*র অর্থ করেছিলেন *'প্রচ্ছন্ন উক্তি' (hidden saying)।*

চর্যাপদের কবিতা

চর্যাপদ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লিখিত হয় নি। মূলত বৌদ্ধ সহজযানপন্থী সহজিয়াগণ তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য গান হিশেবে এই পদগুলি রচনা করেছিল। বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যোগ ও নাথধর্মের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় চর্যাপদ সৃষ্টির পিছনে। প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে বৌদ্ধ সহজযান ধর্ম, সাধনপ্রণালী, দর্শনতত্ত্ব ও নির্বাণলাভ সম্পর্কে পদ রচনা করেছেন কবিগণ। এছাড়া বাংলা, মিথিলা, উড়িষ্যা, কামরূপের সাধারণ জনগণের প্রতিদিনের ধূলি-মলিন জীবনচিত্র, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি বাঙালি আবেগ বিভিন্ন কল্পনাময় রেখাচিত্রের মাধ্যমে কবিতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চর্যাপদের কবিগণের নাম উল্লেখ পূর্বক চর্যায় কবিতা কয়টি ছিল তা নিয়ে মতভেদটি বর্ণনা করা যেতে পারে। চর্যাপদের মোট গানের সংখ্যা সুকুমার সেনের মতে ৫১ টি। সুকুমার সেন তাঁর *'চর্যাগীতি পদাবলী (১৯৫৬)'* গ্রন্থে প্রথমত ৫০ টি কবিতার কথা উল্লেখ করলেও সংযোজন করেছেন যে- *''মুনি দত্ত পঞ্চাশটি চর্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। টীকাকারের কাছে মূল চর্যার পুঁথিতে আরো অন্তত একটি বেশি চর্যা ছিল (একাদশ ও দ্বাদশ চর্যার মাধ্যখানে)। এই চর্যাটির ব্যাখ্যা না থাকায় লিপিকর উদ্ধৃত করেন নাই, শুধু 'টিকা নাই' এই মন্তব্যটুকু করিয়াছেন।''* উল্লেখ্য যে, মুনিদত্ত ছিলেন সংস্কৃত টীকাকার। বৌদ্ধতন্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন বলে চর্যাপদের ব্যাখ্যা হিশেবে ওই সংস্কৃত টীকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। সত্য বলতে, মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা এবং ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক আবিষ্কৃত চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের কারণেই আমরা চর্যার আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থ অনেকটা সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি। অন্যদিকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যায় গানের সংখ্যা ৫০ টি। আসলে চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যায় বলে এই মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

কবির সংখ্যা

চর্যাপদে কবি সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর *'Buddhist Mystic Songs'* গ্রন্থে ২৩ জন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সুকুমার সেন *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)'* গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বতে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথিতে আরো করেকজন নতুন কবির চর্যাগীতি পেয়ে *'দোহা-কোষ*

(১৯৫৭)' গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। ফলে এককথায় বলা যায়, **চর্যাপদের মোট কবির সংখ্য২৩, মতান্তরে ২৪ জন। চর্যাপদ কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পদ**

চর্যাপদ কবিদের জীবনী যা জানা যায়, তা শুধুমাত্র তিব্বতী বিভিন্ন গ্রন্থাবলী থেকে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ভাষা বিজ্ঞানী ও ইতিহাস গবেষকরা তিব্বতী বইগুলোর জার্মান অনুবাদ থেকে চর্যাপদ গীতিকারদের জীবনী খুঁজে পেয়েছেন। যেসব তিব্বতী বইগুলোতে তাঁদের জীবনী রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- *Geschichte des Buddhismus in Indien, Edelsteinmine, Die Geschichten des Vierundachtzig Zauberer (Mahasiddhas), Buddhist Philosophy in India and Ceylon, History of Buddhism in India and Tibet, Catalogue du Fonds Tibetain* ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত, দু'ভাবেই বৌদ্ধ সহজিয়াদের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। চর্যাপদ কবিদেরকে দু'ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। প্রথমত, গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে; দ্বিতীয়ত, চর্যাপদ গীতিকায় তাদের পদের অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমে। প্রথমভাগের ব্যাখ্যা জটিলতর। কেননা বিভিন্ন ভাষা-ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে এই গুরু পরম্পরা নিয়ে। ফলে নিম্নে চর্যাপদ গীতিকায় কবিদের লিখিত পদের অবস্থান অনুযায়ী ক্রমানুসারে চিহ্নিত করা হল-

লুইপা > পদ নং-১/২৯

লুইপা বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের প্রবীণ কবি, এই মত প্রকাশ করেছেন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, লুইপা ছিলেন শবরপার শিষ্য। তাই তিনি প্রথম কবি হতে পারেন না। তাঁর মতে লুইপা ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রীঃ মধ্যে জীবিত ছিলেন। লুইপা বাংলাদেশের লোক ছিলেন। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। *'বস্তন্-গ্যরে শ্রীভগবদভিসময়'* নামক একটি তিব্বতী পুস্তকে তাকে বাংলাদেশের লোক বলা হয়েছে। আবার, তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথের মতে লুইপা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তিনি রাঢ় অঞ্চলের লোক। এবং শ্রীযুক্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর একটি হিন্দী অভিভাষণে বলেছেন – *"লূয়িপা মহারাজ ধর্মাপালকে কায়েস্থ বা লেখক থে।"* লুইপা রচিত পদ দুটি- ১ ও ২৯ নং। তার রচিত সংস্কৃতগ্রন্থগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়- অভিসময় বিভঙ্গ, বজ্রস্তত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদাভসার, তত্ব সভাব। লুইপার প্রথম পদটির দু'টি উল্লেখযোগ্য চরণ-

"কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল ।।"

আধুনিক বাংলায়ঃ
"দেহ গাছের মত, এর পাঁচটি ডাল/ চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে।"

২। কুক্কুরীপা > পদ নং- ২/২০/৪৮

চর্যাপদের দ্বিতীয় পদটি কুক্কুরীপা রচিত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ব্যতীত অন্য অনেকে মনে করেন তিনি তিব্বতের কাছাকাছি কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। নিশ্চিতভাবে বললে কপিলসক্র। মুহঃ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, কুক্কুরীপা বাঙ্গালা দেশের লোক। তার জন্মকাল নিয়ে দ্বিধামত নেই। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে তার জন্ম। কুক্কুরীপার নাম নিয়ে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। ড. সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কুক্কুরীপার ভাষার সাথে নারীদের ভাষাগত মিল আছে। তাই তিনি নারীও হতে পারেন। আবার তার সহচারী যোগিনী পূর্বজন্মে লুম্বিনী বলে কুক্কুরী ছিলেন বলে, তার এই নাম হয়েছে; এমতও পোষণ করেন অনেক ঐতিহাসিক। চর্যাপদে কুক্কুরীপার তিনটি বৌদ্ধগান ছিল। কিন্তু একটি অপ্রাপ্ত। ২ ও ২০ নং তার লিখিত পদ। এবং চর্যাপদে খুঁজে না পাওয়া ৪৮ নং পদটিও তার রচিত বলে ধরা হয়। কুক্কুরীপার পদযুগল ছিল গ্রাম্য ও ইতর ভাষার। কুক্কুরীপার দ্বিতীয় পদটির দু'টি উল্লেখযোগ্য চরণ-

"দিবসহি বহূড়ি কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই ।।"

আধুনিক বাংলায়ঃ
"দিনে বউটি কাকের ভয়ে ভীত হয় / (কিন্তু) রাত হলেই সে কামরূপ যায় ।"

৩। বিরুপা > পদ নং- ৩

বিরুপা বা সংস্কৃতে বিরুপ পাদ রচনা করেছিলেন চর্যাপদের তৃতীয় পদটি। বিরুপার জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ নেই। তিনি রাজা দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায় জন্মেছিলেন। তবে তার জন্মস্থান নিয়ে সন্দেহ আছে। মনে করা হয় অষ্টম শতকে তার জন্ম। কিন্তু মুহঃ শহীদুল্লাহ্র মতে বিরুপা নামে দু'জন ব্যক্তি ছিলেন। একজন জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্য, যিনি সপ্তম শতাব্দীর লোক। আর অন্য জন জালন্ধরীপার শিষ্য। ইনি বাংলার লোক। কিন্তু চর্যাপদের বিরুপার প্রকৃত গুরু ছিলেন জলন্ধরীপাদ। ফলে এখানে হেঁয়ালি রয়েছে। বিরুপা অন্যান্য কবিগণের তুলনায় সামান্য পৃথক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলন বলে জানা যায়। যেমন- তিনি মদ্যমাংসভোজনের অপরাধে বিহার থেকে

বিতাড়িত হয়ে এক আশ্চর্য ক্ষমতা বলে গঙ্গা পার হয়ে উড়িষ্যার কনসতি নগরে আসেন। এবং এখানেও নানা বুজরুকি দেখান। বিরুপার ৩য় পদটি ছিল *'শুঁড়িবাড়ি'* নিয়ে লিখিত। পদটির দুটি চরণ- *"এক সে সুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধই চীঅণ বাকলত বারুণী বান্ধই ।।"*

আধুনিক বাংলায়ঃ *"এক সে শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধায় / চিকন বাকলেতে মদ বাঁধে।"*

৪। গুণ্ডরীপা > পদ নং- ৪

গুণ্ডরীপা চর্যাপদের চতুর্থ পদটি রচনা করেন। তার নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কার্দিয়ার ক্যাটালগে তার এই নাম পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন গুণ্ডরীপা তার বৃতি বা জাতিবাচক নাম। যেমন- এ যুগের কর্মকার বা সরকার। প্রথমত তিনি বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের কবি বলে জ্ঞাত হলেও, অনেকে মনে করেন তিনি বিহারের লোক। রাজা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৯-৮৪১) সময়ের মধ্যে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তার চার নং পদের দু'টি চরণ-

"জোইনি তই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমল রস পিবমি ।।" (পদ ৪)

আধুনিক বাংলায়ঃ *"রে যোগিনী, তুই বিনা ক্ষণকাল বাঁচি না / তোর মুখ চুমিয়া কমল রস পান করি।"*

৫। চাটিল্লপা > পদ নং- ৫

চাটিল্লপা সম্পর্কে বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন, পাঁচ নং পদটি তার শিষ্যের রচিত। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বর্ণ-রত্নাকরে চাটিল্লের নাম লিপিকর প্রমাদে চাটল রয়েছে। তিনি ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছে দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী হিশেবে জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তার পদে নদীমাতৃক অঞ্চলের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমনঃ নদী, সাঁকো, কাদা, জলের বেগ, গাছ, খনন করা ইত্যাদি। সহজ সাধনভজন তত্ত্বকথা এসবের আলোকেই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তার উল্লেখযোগ্য দুটি চরণ-

"ভবণই গহণগম্ভীরা বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন ঠাহী।।" (পদ ৫)

আধুনিক বাংলায়ঃ *"ভবনদী গহন ও গম্ভীর অর্থাৎ প্রবল বেগে প্রবহমান। তার দুইতীর কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল।"*

৬। ভুসুকুপা > পদ নং- ৬/২১/২৩/২৭/৩০/৪১/৪৩/৪৯

পঞ্চাশটি চর্যা-পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক রচনা করেন কাহ্নপা। এবং তার পরেই ভুসুকুপার স্থান। তিনি মোট আটটি পদ রচনা করেন। তার নাম নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। মনে করা হয়, তার আসল নাম *শান্তিদেব*। সুম্‌পা ম্‌খন্‌-পো (১৭৪৭ খ্রীঃ অঃ) তার দ্‌পদ্‌-ব্‌-সম-লজোন্‌-বজন্‌ বইয়ে ভুসুকু সম্পর্কে বলেছেন- "ভুসুকু অষ্টম থেকে এগার শতকের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের রাজা কল্যাণবর্মার পুত্র ছিলেন। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম শান্তিবর্মা ছিল।" এজন্য তাকে শান্তিদেব নামেও ডাকা হয়। বৌদ্ধাচার্য জয়দেব ভুসুকুকে শিক্ষাসমুচ্চয়, সূত্রসমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার নামক তিনটি বই দেন। ভুসুকু নিজের আবাসে একমনে লেখাপড়া করতেন বলে অন্য ভিক্ষুরা তাকে অলস মনে করত। এজন্য তারা তাকে উপহাস কোরে ভুসুকু নামে ডাকত। যেখানে, ভু অর্থ ভুক্তি (ভোজন), সু অর্থ সুপ্ত (শয়ন/নিদ্রা), কু অর্থ কুটির ! ভুসুকুপা বাঙালি ছিলেন। অনুমান করা হয় তিনি পূর্ব বাংলা কবি। তার পদে বাংলার বিভিন্ন চিত্র উজ্জ্বলভাবে ফুঁটে উঠেছে। তার ৪৯ চর্যাটির চারখানা চরণ হল- *"বাজনাব পাড়ী পঁউআ খাঁলে বাহিউ*
অদব বঙ্গাল দেশ লুড়িউ ।।
আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী,
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী ।।" (পদ ৪৯)

আধুনিক বাংলায়ঃ
" বজ্ররূপ নৌকায় পাড়ি দিয়া পদ্মার খালে বাহিলাম। / অদ্বয়রূপ বাঙ্গালা দেশ লুঠ করিলাম। / হে ভুসুকু, আজি বাঙ্গালিনী জন্মিলেন। / চণ্ডালে (তোমার) নিজ গৃহিনীকে লইয়া গেল"।

৭। কাহ্নপা > পদ নং- ৭/৯/১০/১১/১২/১৩/১৮/১৯/২৪ (পাওয়া যায় নি)/৩৬/৪০/৪২/৪৫

কাহ্নপা চর্যাপদকে আলাদা বিশিষ্টতা দান করেছেন। কেননা তিনি সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন। তার মোট পদের সংখ্যা ১৩ টি। যদিও ২৪ নং পদটি তার কি-না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেননা চর্যাপদে ২৪ নং পদটিই খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই মনে করা হয় এটি '*কাহ্নপা*'র রচনা। সর্বাধিক পদ রচনার জন্য তাকে চর্যাপদের সমস্ত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। কাহ্নপা তার সমকালে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। চর্যার বিভিন্ন পদে আমরা তার ভিন্ন ভিন্ন নাম খুঁজে পাই। যেমনঃ- *কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল্য, কৃষ্ণ, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণবজ্র* ইত্যাদি। কাহ্নপা মূলত খ্রীঃ অষ্টম শতকের লোক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, কাহ্নপা উড়িষ্যার কবি। তিনি থাকতেন সোমপুরী বিহারে। বর্তমানে পাহাড়পুরে যে বিহারটি আবিষ্কার করা হয়েছে, সেটিই কাহ্নপার বসতভিটা বলে ধারণা করেন অনেকে। চর্যাগীতিতে যেসকল কবিগণের উল্লেখ আছে, তারা প্রত্যেকেই অন্য কোনো কবির শিষ্য অথবা গুরু। এক্ষেত্রে কাহ্নপার গুরু ছিলেন **জালন্ধরী**; যার

অন্যনাম **হাড়িপা**। এবং জালন্ধরীর গুরু ছিলেন **ইন্দ্রভূতি**। ইন্দ্রভূতির সময়কাল আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ। যেহেতু সোমপুরে কাহ্নপার একটি লিপি পাওয়া যায়, তাই বলা যায়- গোপীচাদের যুগের লেখক। যিনি ৭ম শতকের শেষভাগে ধর্মপাল দেবের রাজত্বকালে সোমপুর বিহারে অবস্থান করেছেন। তাই মোটামুটি সন্দেহাতীতভাবে ৭৬০-৭৭৫ এর মধ্যকার সময়কালে কাহ্নপা চর্যার পদ রচনা করেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। কাহ্নপা ব্রাহ্মণগোত্রের এবং সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধযোগী। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র এবং প্রাচীন সঙ্গীতকলায় তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এজন্য তাকে পণ্ডিত-ভিক্ষু উপাধি দেওয়া হয়। চর্যায় তিনি যেসকল পদ রচনা করেছেন তাতে, তত্কালীন সমাজচিত্র ও প্রেম বিষয়ক বিভিন্ন শৈল্পিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ড.সুকুমার সেন এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন- *"কাহ্নুর চর্যাগীতির রচনারীতিতে অস্পষ্টতা নাই। কয়েকটি প্রেমলীলা-রূপকমণ্ডিত চর্যাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন বলিয়া লইতে পারি।"* এছাড়া তার কাব্যে সহজিয়া বৌদ্ধযান সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব এসেছে। সহজ সম্বন্ধে তার একটি উল্লেখযোগ্য পদ-*"ভন কইসেঁ সহজ বোলবা জাই*
কাআবাক্চিঅ জসু ন সমাই ।।
আলেঁ গুরু উএসই সীস ।।
জেতই বোলী তেতবি টাল ।
গুরু বোব সে সীসা কাল ।।"

আধুনিক বাংলায়ঃ
"বল কেমনে সহজ বলা যায়, যাহাতে কায়বাক্চিত প্রবেশ করিতে পারে না ? গুরু শিষ্যকে বৃথা উপদেশ দেন। বাক্পথাতীতকে কেমনে বলিবে ? যতই তিনি বলেন সে সবই টালবাহানা। গুরু বোবা, সে শিষ্য কালা।"

৮। কম্বলাম্বরপা > পদ নং- ৮

চর্যার আট নং বৌদ্ধগানটি কম্বলাম্বরপার রচিত। তিনি ইন্দ্রভূতি ও জালন্ধরীপার গুরু ছিলেন। ধারণা করা হয়, তিনি কানুপার পূর্ববর্তী এবং কুক্কুরীপা ও লুইপার (কারণ তিনি লুইপার একটি গ্রন্থের টীকা লিখে দিয়েছিলেন) সমকালীন কবি ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তার সময়কাল আনুমানিক ৭৫০ শতকের দিকে। এবং জীবৎকাল ৮৪০ অবধি। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন, কম্বলাম্বরপা কঙ্কারামের বা কঙ্করের রাজপুত্র ছিলেন। এবং দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। অবশ্য অন্য অনেকে মনে করেন- তিনি উড়িষ্যা কিংবা পূর্ব-ভারতবাসী (কার্দিয়ের মতে) ছিলেন। তিনি চর্যায় ভিক্ষু ও সিদ্ধা হিশেবে পরিচিত। প্রচীন বাঙলায় তিনি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন। লোকজীবনের বিভিন্ন জীবন গাঁথা তার কাব্যের অলঙ্কারে বিশেষ শিল্পসুষমারূপ লাভ করেছে। তার রচিত ৮ নং পদটির সংক্ষিপ্ত অংশ হলো-

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী ।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ।।
বাহতু কাম্লি গঅন উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ ।।
ঘুন্টি উপাড়ি মেলিল কাচ্ছি ।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ।।
মাঙ্গত চড়াহিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা ।
বাচত মিলিল মাহাসুহ সাঙ্গা ।।"

আধুনিক বাংলায়ঃ

"আমার করুণা-নৌকা সোনায় ভর্তি রয়েছে; তাতে রূপা রাখার ঠাঁই নেই। অরে কম্বলি পা, গগনের (নির্বাণের) উদ্দেশ্যে তুমি বেয়ে চলো; যে জন্ম গেছে সে ফিরবে কি কোরে ? (নৌকা বাইতে গিয়ে) খুঁটি উপড়ে ফেলো, কাছি মেলে দাও। সদগুরুকে জিজ্ঞেস করো, হে কম্বলি পা, তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে এগিয়ো; কেড়ুয়াল ছাড়া কি বাইতে পারে ? বাম- ডানে চেপে পথ বেয়ে গেলে ওই পথেই মহাসুখের সঙ্গে মিলে যাবে"।

৯। ডোম্বীপা > পদ নং- ১৪

ডোম্বীপা চর্যার অষ্টম পদটি রচনা করেছেন। চর্যায় রহস্যময় চরিত্রগুলোর মধ্যে ডোম্বীপা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতা তার ছিল বলে ধারণা করা হয়। লামা তারকানাথের 'ব্ক'-বব্স্-ব্দুন-ল্দন্' নামক গ্রন্থে তার জীবনী পাওয়া যায়। জার্মান লেখক **Albert Gruenwedel** এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেন *'Edelsteinmine'* নামে। ডোম্বীপা ছিলেন হেরুক পূর্ব দিকের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা। তখন তার নাম ডোম্বী ছিল না। আচার্য তান্ত্রিকের কাছ থেকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যখন দেশ ছেড়ে তিনি বনে-জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করেন, তখন তার নাম ডোম্বী হয়। তার সঙ্গী ছিল ডুমনি নামক এক ডোম জাতীয়া পদ্মিনী। ডোম্বী রাজার যে অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপাখ্যানে- ডোম্বীপা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষালাভ করায় তার প্রজারা তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এতে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়। যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন তা দূর হয়। এতে তান্ত্রিকরা রাজাকে ধর্মবান মনে করেন এবং দেশের প্রজারাও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভে অনুপ্রাণিত হয়।

এছাড়া রাঢ়দেশের হিন্দু রাজা বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি সাধন করায় ডোম্বী সেখানে উপস্থিত হন এবং অলৌকিক বলে রাজা-প্রজা সকলকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি কর্ণাটকের সমুচ্চয় নামক রাজার তৈরি লিঙ্গাইত মথে ৮০০ টি স্তূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মাটিতে মিশিয়ে দেন। এসবই আল্‌বার্ট গ্রুন্‌ভেডেলের অনুবাদ বইয়ে উল্লেখ আছে। এছাড়া তার অন্য আরেকটি তিব্বতী বই- 'গ্রুব্‌-থোব্‌-ব্‌-র্গ্যদ্‌-চু-র্চ-ব্‌ জিই-র্ণম-থর' এর জার্মান অনুবাদ *Die Geschichten der Vierundachtzig Zauberes (Mahasiddhas)*-এ ডোম্বী সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে উল্লেখ হয়েছে, ডোম্বী মগধের রাজা। বিরুপা তার গুরু। অবশ্য তার সঙ্গিনী ডুমনির কথা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি অলৌকিক ঘটনা হল- প্রজাদের অনুরোধে যখন রাজা বন হতে দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি ডুমনিসহ নিজেকে সাত দিন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রেখে নতুন দেহ নিয়ে বের হয়ে আসেন। তখন তার নাম হয় আচার্য ডোম্বী। ডোম্বীপা ছিলেন দীর্ঘজীবী পুরুষ। তার সময়কাল মোটামুটি ৭৯০ থেকে ৮৯০ খ্রীষ্টব্দের মধ্যে, দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯ খ্রীঃ)। চর্যায় ১৪ নং গানটি মূলত ধনসী রাগে রচনা করেছিলেন তিনি। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদীর দৃশ্য, কড়ি ছাড়াই মাঝিদের নৌকা পার করে দেওয়ার কথা রয়েছে। তার ১৪ নং পদটির সংক্ষেপ হলো-

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই ।।
বাহ তু তোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা
সদ্গুরু পাও-পসাএঁ জাইব পুণু জিণউরা ।।
পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পীঠত কাছী বান্ধী
গতণ দুখোলে সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ।।
চান্দ সূজ্জ দুই চাকা সিঠিসংহার পুলিন্দা
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা ।।
কাবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছলে পার করেই
*জো রথে চড়িলা বাহ্ম ণ জানি কুলেঁ কুল বুলই ।।"**

আধুনিক বাংলায়ঃ
"গঙ্গা যমুনা মাঝে রে বয় নৌকা,
তাউ চড়িয়া চণ্ডালী ডোবা লোককে অনায়াসে পার করে ।।
বা তুই ডুমনি ! বা লো ডুমনি ! পথে হইল সাঁঝ,

সদ্‌গুণ পায়ের প্রসাদে যাইব পুনরায় জিনপুর ।।
পাঁচ দাঁড় প্রিতে নৌকার গলুইয়ে, পিঠে কাছি বাঁধিয়া
গগন-রূপ সেচনী দিয়ে ছেঁচ, পানি পশে না ছেঁদায় ।।
চাঁদ সূর্য্য দুই চাকা, সৃষ্টি সংহার মাস্তুল,
বাঁ-ডাইন দুই রাস্তা বোধ হয় না, বা তুই স্বচ্ছন্দে ।।
কড়ি লয় না, পয়সা লয় না, মাগনা পার করে,
যে রথে চড়িল (পথ) বাহিতে না জানিয়া কূলে কূলে বেড়ায় ।।"

*ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর তিব্বতী তর্জমার আলোকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মূল পদ সংশোধিত অংশ।

১০। শান্তিপা > পদ নং- ১৫/২৬

শান্তিপা চর্যার পনের এবং ছাব্বিশ নং পদ রচনা করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল রত্নাকর শান্তি। খ্রিষ্টীয় এগার শতকের প্রথম দিকে তার কাল নির্ধারণ করা হয়। বিহারের বিক্রমশীলায় বাস করতেন তিনি। বিক্রমশীল বিহারের দ্বার পণ্ডিত হিশেবেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের গুরু ছিলেন তিনি। বৌদ্ধধর্মের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এবং একাদশ শতকে সজহযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহল যাত্রা করেন। তার গীতে নদীমাতৃক দেশের রূপ ফুঁটে উঠেছে। নৌকার উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে নৌকা চালনা, গুণ টানা, জল সেচা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদির চিত্র উঠে এসেছে। প্রাচীন মৈথিলী ভাষা ব্যবহার কোরে তিনি রচনা করেছেন এই বৌদ্ধগান দুটি। গান দুটির একটি হল-

"সঅসম্বেঅণসরুঅবিআরেঁ অলক্‌খ লক্‌খণ ন জাই।
জে জে উজূবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই॥ ধ্রু॥
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢা উজূবাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ্ ভূলহ রাজ পথ কন্ধারা॥ ধ্রু॥
মায়ামোহসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥ ধ্রু॥
সুনা পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজূবাট জাঅন্তে॥ ধ্রু॥
বাম দাহিণ দোবাটা ছ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।

ঘাট ন গুমা খড় তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ॥ ধ্রু ।।''

আধুনিক বাংলায়ঃ

"স্বয়ং-সংবেদন-স্বরূপ বিচারে
অলখ হয় না লক্ষণ;
সোজা পথে গেল যে-যে, আর হয় না রে
তাদের প্রত্যাবর্তন!
কূলে-কূলে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ো না, মূঢ়,
সোজা পথ এই সংসার–
ভুল পথে তিলার্ধ না যেন রে ঘুরো,
কানাত-মোড়ানো রাজ-দ্বার।
মোহের মায়ার এই মহাসিন্ধুর
না-বুঝিস কূল আর থৈ,
নাও নাই, ভেলা নাই, দেখ যত দূর,
নাথে না শুধাও, পাবে কই।
শূন্য এ পাথারের পরিসীমা নেই,
তথাপি রেখো না মনে দ্বিধা–
অষ্টসিদ্ধিলাভ হবে এখানেই
হামেশা চলিস যদি সিধা।
শান্তি বলেন, বৃথা মরিস না খুঁজে,
তাকাস নে বামে দক্ষিণে;
সোজা পথে অবিরত চল্ চোখ বুজে,
সহজিয়া পথ নে রে চিনে।"

১১। মহীধরপা > পদ নং- ১৬

মহীধরপা চর্যার ষোল নং পদ রচনা করেন। তার অন্য নাম মহিল। খ্রিষ্টীয় নবম শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন বলেন ধরা হয়। এবং তার জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। তিনি ত্রিপুরা অঞ্চলে ছিলেন। কিন্তু তার সময়ে ত্রিপুরা মগধ অন্ধলের মধ্যে ছিল। তাই প্রকৃতই তিনি মগধ অঞ্চলে বাস করতেন। বিগ্রহ পাল-নারায়ন পালের রাজত্বকালে তিনি চর্যায় পদ রচনা করেছিলেন। চর্যার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কবি কাহ্নপার শিষ্য ছিলেন তিনি। কারও মতে তিনি দারিক পার শিষ্য। কাহ্নপার

সাথে তিনি চটিগায়েঁ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এবং মহিত্তা ভণিতা দিয়েছেন। প্রাচীন মৈথিলী ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি, কাব্য রচনার জন্য। তার পদে পাপ ও পুণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

১২। বীণাপা > পদ নং- ১৭

বীণাপা চর্যার সতের তম পদটি রচনা করেন। মনে করা হয়, বীণা তার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র হওয়ার কারণে তার নাম বীণা ছিল। খ্রিষ্টীয় নবম শতকের সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে সর্বজন গৃহীত। তবে সুখময় মুখোপাধ্যায় তার ‘প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়’ গ্রন্থে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মত তুলে ধরেছেন এ সম্পর্কে। তার মতে, বীণাপা দশম শতকের শেষভাগের কবি। এবং তার গুরু ভাদ্রপা। অথচ অন্য সকল ভাষাবিদের মতে, তিনি বুদ্ধপার শিষ্য ছিলেন। তিনি গহুর (গৌড়) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিষ্য ছিলেন বিলস্যবজ্র এবং তিনি দোম্বীপাদের সমকালীন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে চর্যায় গীত রচনার পাশাপাশি তিনি একটি গ্রন্থ ‘*বজ্রডাকিনীনিষ্পন্নক্রম*’ রচনা করেন। তার সতের নং পদে সূর্য-চন্দ্রকে উপমা ধরে চমৎকার পরিবেশের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৩। সরহপা > পদ নং- ২২/৩২/৩৮/৩৯

চর্যায় আরেকজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন সরহপা। তৎকালীন একাধিক সরহ থাকায় কিছুটা গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, অনেকে মনে করেন, নাগার্জুনের গুরু হলেন সরহপা। আসলে, তিনিও সরহ ছিলেন। কিন্তু চর্যার সরহের নামের সাথে বিশেষ সম্মানসূচক পদবি ‘পা / পাদ’ যুক্ত ছিল। সরহপা পূর্ববঙ্গের রাজ্ঞীদেশের উত্তরবঙ্গ-কামরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কামরূপের রাজা ছিলেন রত্নপাল। তার সময়কাল ১০০০ থেকে ১৩০০ খ্রীঃ অঃ। সরহের শিষ্য ছিলেন এই রাজা। সরহ তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে রাজাকে দীক্ষা দেন। সরহের নিজ জাতি ছিল বাহ্মণ। পরে তিনি ভিক্ষু ও সিদ্ধা হন। এগার শতকের দিকে জীবিত এই কবি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। ২২১ নেপাল সংবৎ (১১০১ খ্রীঃ) লেখা সরহের একটি দোহা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এছাড়া অপভ্রংশ ভাষায় তার একটি দোহাকোষ পাওয়া যায়। চর্যায় রচিত তার চারটি পদাবলির ভাষা ছিল বঙ্গকামরূপী। তার পদে শবর-শবরীর প্রেমকাহিনী এবং কতিপয় সরলত্ব কথা প্রকাশ পেয়েছে। তার ৩৮ নং পদের দুটি চরণ-

“কাঅ ণাবডহি খান্টি মন কেড়ুয়াল। সদগুরুবঅণে ধর পতবাল। ।“ (পদ ৩৮)

আধুনিক বাংলায়ঃ

"কায় [হইল] ছোট নৌকাখানি, মন [হইল] কেরোয়াল। সদ্গুরু-বচনে পতবাল (পাল) ধর।" (অনুবাদ: সুকুমার সেন)

১৪। তন্ত্রীপা > পদ নং- ২৫ (পাওয়া যায় নি)

চর্যাপদ গীতিকায় একমাত্র তন্ত্রীপার পদটিই খুঁজে পাওয়া যায় নি। এজন্য তার সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তার 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন- *"তন্ত্রীপাদের পদটি বৌদ্ধগানের খণ্ডিত অংশে থাকায় আমরা তা পাই না।"* অন্যক্ষেত্রে বৌদ্ধাগানের সংকল 'Buddist Mystic Songs' গ্রন্থে বলেছেন-*"Tantripa is the author of the song no. 25. He was a disciple of Jalandharipa and afterwards of Kanhapa. In the ms. He is missing."*

১৫। শবরপা > পদ নং- ২৮/৫০

মুহঃ শহীদুল্লাহর মতে, শবরপা'র জীবনকাল ৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তাই মুহঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন, শবরপা চর্যার কবিদের মধ্যে প্রাচীন কবি এবং তিনি বাংলাদেশের লোক। শবরপা লুইপা'র গুরু এবং নাগার্জুনের শিষ্য ছিলেন।সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলে তিনি মোট ১৬টি গ্রন্থ লিখেছেন। চর্যাপদে ২৮ ও ৫০ নং পদ দুটি তার রচনা। শবরপাদের একটি পদে দেখা যায় নরনারীর প্রেমের এক অপূর্ব চিত্রণ-

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরণী ণামে সহজ সুন্দারী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।।" (পদ ২৮)

আধুনিক বাংলায়ঃ

"উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। তার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালিকা। নানা তরু মুকুলিত হলো। তাদের শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হলো। শবর-শবরীর প্রেমে পাগল হলো। কামনার রঙে তাদের হৃদয় রঙিন ও উদ্দাম। শয্যা পাতা হলো। শবর-শবরী প্রেমাবেশে রাত্রিযাপন করলো।"

১৬। আর্যদেবপা > ৩১

আর্যদেবপা চর্যার একত্রিশ নং পদটি রচনা করেন। তার আসল নাম হল আজদেব। খ্রিষ্টীয় অষ্টম

শতকের প্রথমার্ধের কবি ছিলেন তিনি। সিংহল দ্বীপে তার জন্ম হয়। এক্ষেত্রে বলা যায় তিনি কম্বলারপার সমকালীন ছিলেন। আর্যদেব মূলত মেবারের রাজা রাজা ছিলেন। পরে গোরক্ষনাথের কাছ থেকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং তার শিষ্য হিসেবে পদলাভ করেন। তার ভাষা বাংলা ও উড়িয়া মিশ্রিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, *"তাঁহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালা বটে, কিন্তু উড়িয়া ভাষা বলাই সঙ্গত।"*

১৭। ঢেণ্ডণপা > ৩৩

ঢেণ্ডণপা চর্যার একটিমাত্র পদ (তেত্রিশ নং) রচনা করেন। তার আসল নাম হল ঢেণ্ঢস। যা জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণ-রত্নাকর'-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। খ্রিষ্ট্রীয় নবম শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন। তার জন্মস্থান অবন্তিনগরত-উজ্জয়িনী। তার জীবৎকাল ৮৪৫ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে বলা যায় তিনি দেবপাল-বিগ্রহপালের সমকালে ছিলেন। ঢেণ্ডণপা মূলত তাঁতি এবং সিদ্ধা ছিলেন। এজন্য তার পদে বাঙালি জীবনের চিরায়ত দারিদ্রের চিত্র ফুটে উঠেছে কাব্যিক সুষমায়। তার এই পদযুগলটি উল্লেখযোগ্য-

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী" (পদ ৩৩)

আধুনিক বাংলায়ঃ
"টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।"

১৮। দারিকপা > ৩৪

দারিকপা চৌত্রিশ নং বৌদ্ধগানটি রচনা করেন। তার আসল নাম ইন্দ্রপাল। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে ও নবম শতকের শুরুতে তার সময়কাল ছিল বলে ধারণা করা যায়। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি সালিপুত্র নামক স্থানের রাজা ছিলেন। যার জন্মস্থান উড়িষ্যার শালীপুত্রে। সিদ্ধা পদলাভের পরে তিনি দারিক নাম ধারণ করেন। লুইপার কাছ থেকে তিনি সিদ্ধ লাভ করেন এবং তার শিষ্য হিসেবে মর্যাদা পান। তবে এক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মতে, *"দারিকপা লুইপার সাক্ষাৎ শিষ্য নন, শিষ্য পরম্পরার একজন"*। চর্যায় তার রচিত পদটি প্রাচীন বাংলা ভাষার। তথাদৃষ্টি ও সপ্তম সিদ্ধান্ত গ্রন্থদুটিও দারিকপাদ রচনা করেন।

১৯। ভাদেপা > ৩৫

ভাদেপার চর্যায় ভদ্রপাদ নামে পরিচিত। পঁয়ত্রিশ নং বৌদ্ধগানটি তিনি রচনা করেছেন। তার জন্ম হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে। এবং বিখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তার জীবনের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। এথেকে বোঝা যায় যে, ভাদেপা বিগ্রহ ও নারায়ন পালের রাজত্বকালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। তার জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র মতে তার জন্ম মণিভদ্র। কিন্তু অন্য অনেকে মনে করেন শ্রাবন্তী এলাকায়। তিনি কাহ্নপা, মতান্তরে জালন্ধরীপার শিষ্য ছিলেন। তিনি পেশায় চিত্রকর চিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভের পর সিদ্ধা হন। ভাদেপার পদে মূলত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন বিষয় ফুটে উঠেছে। তার পদের প্রথম দুই পঙক্তি-

“এতকাল হঁউ আছিলোঁ স্বমোহেঁ
এবেঁ মই বুঝিল সদ্ গুরু বোহেঁ” // (পদ ৩৫)

আধুনিক বাংলায়ঃ
"এতকাল আমি স্বমোহে ছিলাম
এখন সদগুরু বুঝলাম।"

২০। তাড়কপা > ৩৭

চর্যায় যেসব কবি পদ রচনা করেছেন, তাদের প্রত্যেককে “গ্রুব্-ছেন-গ্যব্শি” বা মহাসিদ্ধ বলা হয়ে থাকে। Albert Gruenwedel যে ৮৪ জন মহাসিদ্ধের নাম প্রকাশ করেন, তার মধ্যে তাড়কপা উল্লেখ নেই। ফলে তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তাড়কপার আসল নাম হল ‘নাড়কপা’। তবে ড.মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ এটিকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেন। চর্যার সাইত্রিশ নং পদটি তাড়কপা রচিত।

২১। কঙ্কণপা > ৪৪

কঙ্কণপা চর্যার চুয়াল্লিশ নং বৌদ্ধগানটি রচনা করেন। তিনি খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগের কবি

ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তবে অনেক গবেষক এ মত প্রকাশ করেন- কঙ্কণপা ৯৮০ থেকে ১১২০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বিক্ষুনগরের রাজা ছিলেন। পরবর্তিতে তার গুরু কম্বলাম্বরের কাছ থেকে বৌদ্ধ ধর্মে দিক্ষা লাভ করে সিদ্ধ হন। তবে অনেক ভাষাবিদ এ মত-ও প্রকাশ করেন যে- তিনি কম্বলাম্বরের বংশধর ছিলেন এবং দারিকপাদের শিষ্য ছিলেন। কঙ্কণপার রচিত বৌদ্ধগানটির ভাষা অপভ্রংশ। এ থেকে বলা যায় তার ভাষা ছিল বাঙলা এবং অপভ্রংশ মিশ্রিত।

২২। জয়নন্দীপা > ৪৬

জয়নন্দীপা-এর আসল নাম জয়ানন্দ। চর্যার ছেচল্লিশ নং পদটি তিনি রচনা করেন। তার জন্ম বাংলাদেশে। বলা হয় বাংলাদেশের কোনো এক রাজার মন্ত্রী নিযুক্ত ছিলেন তিনি। জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার রচিত পদে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমনঃ তার মূল ভাষা ছিল গৌড় অপভ্রংশের পরবর্তী আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ। যা মিথিলা প্রদেশের ভাষা মৈথীলা, উড়িষ্যার ওড়িয়া, বঙ্গঅঞ্চলের বাংলা ও আসামের ভাষার সংমিশ্রণ বা সদৃশরূপ।

২৩। ধর্মপা > ৪৭

চর্যার সর্বশেষ কবি হলেন ধর্মপা। তিনি চর্যার সাতচল্লিশ নং পদটি রচনা করেন। ধর্মপা বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিষ্টীয় নবম শতকের শুরুর দিকে তার জন্ম হয় এবং প্রায় ৮৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। গোত্র ছিল ব্রাহ্মণ। এ থেকে বোঝা যায় বিগ্রহ নারায়ণ পালের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন এব এবং ঢেণ্ডণপার সমকালীন ছিলেন। ধর্মপা কাহ্নপার শিষ্য। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষালাভের পর তিনি ভিক্ষু ও সিদ্ধা হন। চর্যায় তার রচিত পদটির ভাষা বাংলা। উক্ত পদে অগ্নিকাণ্ডের প্রতীকে গভীর যোগতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

• •• তথ্যসূত্রঃ• ••

১. বাংলা সাহিত্যের কথা – মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য- দীনেশচন্দ্র সেন
৩. বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য- প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৪. প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কালক্রম- সুখময় মুখোপাধ্যায়
৫. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. কতো নদী সরোবর- হুমায়ুন আজাদ
৭. সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা- আহমদ শরীফ
৮. লাল নীল দীপাবলি- হুমায়ুন আজাদ
৯. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- সৌমিত্র শেখর
১০. ভাষার ইতিবৃত্ত- সুকুমার সেন
১১. The Origin and Development of the Bengali language- C. Suniti Kumar
১২. ভাষা-শিক্ষা – হায়াৎ মামুদ
১৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- মাহবুবুল আলম

● ● ● ●সহায়ক লিঙ্ক● ● ●

● উইকিপিডিয়া

● চর্যাগীতি

● চর্যাপদ থেকে অনুবাদ ___ সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

●চর্যাপদ' কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

●●●একটি চর্যাগান●●●

॥১২॥

কৃষ্ণপাদানাম্ (কাহ্নপাদানাম্)
রাগ-ভৈরবী

করুণা পীঢ়িহি১ খেলহুঁ নঅবলা /
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ধ্রু॥
ফীটিউ২ দুআ আদেসি রেঅ ঠাকুর /

উআরিঔ উএসেঁ৫ কাহ্ন৬ ণিঅড় জিনউর ॥ধ্রু॥
পহিলেঁ তোলিআ৭ বড়িআ ৮ ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘোলিউ৯ ॥ধ্রু॥
মতিএঁ১০ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা ।
অবস১১ করিআ ভববল জিত্তা১২ ॥ধ্রু॥
ভণই কাহ্ন৬ আম্‌হে১৩ ভলি দাহ১৪ দেহুঁ ।
চউসট্‌ঠী১৫ কোঠা গুণিআ লেহুঁ ॥ধ্রু॥

চর্যাগানটির অডিও লিঙ্কঃ গানঃ চর্যা- ১২

সূত্রঃ গানঃ চর্যা- ১২ _ অচিন্ত্য

চর্যাপদ থেকে অনুবাদ

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ | ১৬ মার্চ ২০০৮ ১০:৩৮ পূর্বাহ্ন

কৈফিয়ত

(ছুটন্ত সেই হরিণের আর যায় না দেখা খুর…)

স্কুলজীবনের শেষের দিকে, ১৯৭৮-৭৯ নাগাদ আমার নিত্যকার বাংলা বাজারের ফুটপাত পরিক্রমার সময়ে আরও অনেক পাঠ্যাপাঠ্যের সাথে হরলাল রায়ের *চর্যাগীতিকা* নামে একখানা বইও আমার শেলফে উঠে আসে। প্রথমবার নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বুঝতে পারি যে এ ক্যালকুলাস, “শিশুদের জন্য নহে”। তারপর, হয়তো কলেজে উঠে বইটা আবার সাহস ক’রে পড়তে গিয়ে (হরলাল রায়ের গদ্যায়নের বদৌলত) একটা কবিতায় গিয়ে চম্‌কে উঠলাম একেবারে : “দুলি দুহি পীটা ধরণ ন যাঅ। / রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাঅ। / আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী। / কানেট চোরে নিল আধরাতী। / সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ। / কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ। / দিবসহি বহুড়ী কাউই ডর ভাঅ। / রাতী ভইলে কামরু জাঅ। / অইসন চর্যা কুক্কুরীপাএ গাই। / কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাই।” (চর্যা ২, কুক্কুরীপা)। নেশা ধ’রে গেল। একের পর এক পঙ্‌ক্তি তারপর থানা গাড়ল এসে মাথার ভিতরে। আরও কিছু বইয়ের খোঁজখবর হ’ল নানা লাইব্রেরিতে, দোকানে, আবছা-আবছা সন্ধ্যা-সন্ধ্যা আলাপপরিচয় হ’তে লাগল শ্রমণ-কবিদের সাথে। শেষে আরও কয়েক বছর পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন, প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে বোধ করি, কয়েকটা কবিতার তরজমা হ’য়ে গেল, আর আরও কিছুদিন পর সহপাঠী বন্ধু কবি সৈয়দ তারিকের নির্বন্ধে ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন জর্নাল, *প্রতীতি*-তে দশটি অনুবাদ বেরোলে পর শিক্ষক অধ্যাপক ফকরুল আলম যেচে এসে প্রশংসা করলেন (তদ্দিন অবধি তাঁর-আমার সম্পর্কটা বড়একটা মধুর ছিল না বটে)। আর আমার প্রাণ ভ’রে গেল। আর ধীরে ধীরে সবক’টারই অনুবাদ হ’য়ে গেল ১৯৮৮-র মধ্যে। বই হ’য়ে (*অন্তউড়ি*) বেরুল পরের বছর ১লা বৈশাখ…

আমার অন্য সমস্ত বইয়ের মতো এটাও বাজারে বড়একটা পাওয়া যায় নি কখনও, বিক্রি হওয়া দূরে থাক।

অনেক বছর পর আমি অনুবাদগুলো কম্পিউটারে কম্পোজ করতে গিয়ে কিছু সংশোধন করবার সুযোগ পেলাম। কোনো বুদ্ধিভ্রষ্ট প্রকাশক রাজি হ'য়ে গেলে আবার প্রকাশিত হ'তে পারবে হয়তো, তার আগে এখানে থাকুক।

চর্যাপদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ইচ্ছা আমার আছে, যদিও সময় নাই। নেই-নেই ক'রে এ নিয়ে পড়েছি মন্দ না। কিন্তু এই কবিতাগুলির কোনো সত্যিকারের সাহিত্যিক আলোচনা আজ অব্দি দেখি নি। শুনেছিলাম যে আমার অজ্ঞাতসারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চর্যাপদগুলোকে আমারই মতো আধুনিক বাংলা পদ্যে প্রতিসর্জন করেছিলেন। সে-বইটি কখনও দেখি নি। হয়তো তাতে চমৎকার কোনো সাহিত্যিক আলোচনা ছিল, কিন্তু হায় তা আমার দেখা হ'ল না।

চর্যাপদে প্রতীকের যেমন বহুমাত্রিক, শিক্ষিত, সচেতন প্রয়োগ আমি দেখেছি, তেমন তার পরেকার কোনো বাংলা কবিতায় দেখি নি। রবীন্দ্রনাথে না, এমনকি জীবনানন্দেও না। তেমন দেখি নি মানে কিন্তু একেবারে দেখি নি তা নয়, মারতে আসবেন না না-বুঝে। এ নিয়ে বড়লেখক কেউ লিখে না ফেললে আমিই লিখব পরে, যদি ও যেমন পারি, কিন্তু ততদিন, পাঠক, এই তরজমাগুলির স(হায়)হায়তায় চর্যাপদে মনোনিবেশ করুন (যদি জীবনে আর কোনো কবিতা পড়বেন না, এমন পণ ক'রে না-ফেলে থাকেন, বা এমনকি ক'রেও থাকেন)। স্বাগতম্।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ ॥

চর্যা-১
লুই

শরীরের গাছে পাঁচখানি ডাল–
চঞ্চল মনে ঢুকে পড়ে কাল।
দৃঢ় ক'রে মন মহাসুখ পাও,
কী-উপায়ে পাবে গুরুকে শুধাও।
যে সবসময় তপস্যা করে
দুঃখে ও সুখে সেও তো মরে।
ফেলে দাও পারিপাট্যের ভার,
পাখা ভর করো শূন্যতার–
লুই বলে, ক'রে অনেক ধ্যান
দেখেছি, লভেছি দিব্যজ্ঞান।

চর্যা-২
কুক্কুরী

কাছিম দুইয়ে উপচে পড়ে ভাঁড়,
গাছের তেঁতুল কুমিরের খাবার,

ভেদ নাই আর ঘরে-আঙিনাতে,
কানেট চোরে নিল অর্ধরাতে–
শ্বশুর ঘুমে, বধূ একা জাগে,
কানের কানেট কার কাছে সে মাগে?
দিনে বধূ কাকের ডরে কাঁপে,
রাতদুপুরে সে-ই ছোটে কামরূপে!
কুক্কুরীপার চর্যা এমনই যে
কোটির মাঝে একজন তা বোঝে।

চর্যা-৩
বিরুপা

এক সে শুঁড়িনি, ঢোকে দুইখানি ঘরে,
চিকন বাকলে মদ্য ধারণ করে।
সহজে এ-মদ চোলাই করো রে, তবে
অজর অমর দৃঢ়স্কন্ধ হবে।
দশমীর দ্বারে ছদ্ম আমন্ত্রণ
দেখে, খদ্দের সেদিকে ধাবিত হ'ন–
পসরা সাজানো চৌষট্টি ঘড়ার,
খদ্দের ঢুকে বা'র হয় না রে আর।
একটাই ঘড়া, অতি-সরু মুখ তায়–
বিরু বলে, ঢালো ধীরে ধীরে ঘড়াটায়।

চর্যা-৪
গুণ্ডরী

জঘনের চাপে, যোগিনী, আলিঙ্গন দে!
দিন কেটে যাক পদ্ম-বজ্র-বন্ধে।
মুখ-ভরা তোর কমলের রস, চুমুর চুমুকে খাব।
একমুহূর্ত না যদি থাকিস তাহলেই ম'রে যাব।
খেপে গেছি আমি, যোগিনী আমার, মেয়ে,
ঊর্ধ্বলোকেই করেছি যাত্রা মণিমূল বেয়ে বেয়ে–
শাশুড়ির ঘরে তালাচাবি হ'ল আঁটা
চাঁদ-সূর্যের দু'পাখা পড়ল কাটা।
গুণ্ডরী বলে, আমি সুরতের হেতু
নর-নারী-মাঝে ওড়ালাম কামকেতু।

চর্যা-৫
চাটিল

ভবনদী বয় বেগে গহিন গভীর,
মাঝগাঙে ঠাঁই নাই, পঙ্কিল দু'তীর–
চাটিল ধর্মের জন্য সাঁকো গড়ে তায়,
পারগামী লোক তাতে পার হ'য়ে যায়।
অদ্বয়-কুঠারে চিরে মোহতরু, তার
তক্তা জুড়ে নির্বাণের সাঁকো হ'ল দাঁড়।
চেয়ো না ডাইনে বাঁয়ে এ-সাঁকোয় চ'ড়ে,
দূরে নয়, বোধি আছে নিকটেই ওরে।
কীভাবে ওপারে যাবে, যারা যেতে চাও,
অনুত্তর স্বামী গুরু চাটিলে শুধাও।

চর্যা ৬

ভুসুকু

কারে করি গ্রহণ আমি, কারেই ছেড়ে দেই?
হাঁক পড়েছে আমায় ঘিরে আমার চৌদিকেই।
হরিণ নিজের শত্রু হ'ল মাংস-হেতু তারই,
ক্ষণকালের জন্য তারে ছাড়ে না শিকারী।
দুঃখী হরিণ খায় না সে ঘাস, পান করে না পানি,
জানে না যে কোথায় আছে তার হরিণী রানি।
হরিণী কয়, হরিণ, আমার একটা কথা মান্ তো,
চিরদিনের জন্য এ-বন ছেড়ে যা তুই, ভ্রান্ত!
ছুটন্ত সেই হরিণের আর যায় না দেখা খুর–
ভুসুকুর এই তত্ত্ব মূঢ়ের বুঝতে অনেক দূর।

চর্যা ৭

কানু

আলিতে কালিতে পথ আটকায়,
তাই দেখে কানু বিমনাঃ, হায়!
কানু বলে, কই করব রে বাস?
যারা মন জানে তারা উদাস।
তিন জন তারা, তারা যে ভিন্ন,
কানু বলে, তারা ভবচ্ছিন্ন।
এই আসে তারা, এই হয় হাওয়া
বিমনাঃ কানু এ' আসা ও যাওয়ায়।
নিকটেই জিনপুর: কীভাবে
মোহান্ধ কানু সেখানে পালাবে?

চর্যা ৮

কম্বলাম্বর

করুণা-নৌকা পূর্ণ সোনায়,
রুপা রাখবার জায়গা কোথায়?
যাও রে, কামলি, আকাশের দেশে–
জন্ম গেলে কি আর ফিরবে সে?
খুঁটি উপড়িয়ে, কাছি খুলে শেষে,
বাও রে, কামলি, গুরু-উপদেশে।
গলুইতে চ'ড়ে চৌদিকে চাও,
হাল তো নাই, কে বাইবে এ-নাও?
বাঁয়ে আর ডানে চেপে চেপে গেলে
ঠিক পথ পেয়ে মহাসুখ মেলে।

চর্যা ৯

কানু

উপ্‌ড়ে কালের শক্ত খুঁটি
বিবিধ ব্যাপক বাঁধন টুটে
সহজ-নলিনীকুঞ্জে ঢুকে
মাতাল কানাই তৃপ্ত, সুখে।
হাতির যে-প্রেম হাতিনির তরে
তথতা সে-মদ বর্ষণ করে,
ষড়্গতি স্বস্বভাবে শুদ্ধ,
ভাবাভাবে কিছু নয় বিরুদ্ধ–
দশ দিকে রেখে দশ রতন
বিদ্যা-করীকে করি দমন।

চর্যা ১০

কানু

লো ডোমনি, তোর নগর-বাইরে ঘর,
নেড়া বামুন আমায় স্পর্শ কর্!
আ লো ডোমনি, তোরে আমি সাঙ্গা করব ঠিক,
জাত বাছে না কানু, সে যে নগ্ন কাপালিক।
একখানি সে পদ্ম, তাতে চৌষট্টিটা পাপড়ি,
তার উপরে ডোমনি নাচে, কী নৃত্য তার, বাপ রে!
ডোমনি, তোরে প্রশ্ন করি, সত্যি ক'রে বল্,
কার নায়ে তুই এপার-ওপার করিস চলাচল?

আমার কাছে বিক্রি করিস চাঙাড়ি আর তাঁত,
নটের পেটরা, তোর জন্যেই, দিই না তাতে হাত।
তোর জন্যেই, হ্যাঁ লো ডোমনি, তোর জন্যেই যে
এই কাপালিক হাড়ের মালা গলায় পরেছে।
পুকুর খুঁড়ে মৃণাল-সুধা করিস ডোমনি পান–
ডোমনি, তোরে মারব আমি, নেব রে তোর প্রাণ!

চর্যা-১১
কানু

দৃঢ়করে ধরা নাড়ির তরু
বাজে অনাহত বীর-ডমরু
কানু যোগাচার সাধন করে,
একাকার ঘোরে দেহ-নগরে।
আলি-কালি পায়ে নূপুর ক'রে
সূর্য-চাঁদের মাকড়ি প'রে
ষড়রিপু ক'রে ভস্মসার
পরে সে মোক্ষমুক্তাহার।
মেরে সে শাশুড়ি ননদ শালি
এবং মায়াকে, কানু কাপালিক।

চর্যা-১২
কানু

খেলতে ব'সে দাবা করুণা-পিঁড়ায়
জিতেছি ভববল গুরুর কৃপায়:
রাজাকে আটকাই দুইমুখা চালে,
সামনে জিনপুর তাই তো কপালে।
প্রথমে গজ চেলে বড়েগুলি, আর
পাঁচটি আরও ঘুঁটি খেয়ে ফেলি তার,
মন্ত্রী দিয়ে শেষে রাজাকেই খাই,
কিস্তিমাত ক'রে ভববল পাই–
ভালোই দান চালি, কানু বলে এই,
চৌষট্টিটা ছঁক গুনে গুনে নেই।

চর্যা-১৩
কানু

ত্রিশরণ-নায়ে, আট কামরায়
এ-দেহ ভাসিয়ে দেখি
আমারই আপন দেহে মিলে যায়
শূন্য-করুণা, এ কী!
স্বপ্ন ও মায়া জেনে এ-জীবন,
ভবনদী তরলাম,
মাঝগাঙে এক ঢেউয়ের মতন
অনুভব করলাম।
পাঁচ তথাগতে দাঁড় ক'রে দেহ-নায়ে
কানু পার্থিব মায়াজাল ত'রে যায়।
গন্ধ রস ও স্পর্শ থাকুক
নিদ্রাবিহীন স্বপ্নের মতো,
শূন্যে, মনেরে মাঝি ক'রে, সুখ–
সঙ্গমে কানু হ'ল নির্গত।

চর্যা-১৪

ডোমনি

পারাপারের নৌকা চলে গঙ্গা-যমুনায়,
মাতঙ্গিনী, যোগীকে পার করে সে-খেয়ায়।
সাঁঝ ঘনাল, বাও রে, ডোমনি, জোরসে চালাও না',
গুরুর কৃপায় জিনপুরে ফের রাখব আমার পা।
পাঁচটি বৈঠা পাছ-গলুইয়ে, পিঁড়ায় বাঁধা দড়ি,
আকাশ-সেঁউতি দিয়ে নৌকা সেচো পড়িমরি।
সূর্য-চাঁদের লাটাই-দু'টি গোটায় এবং খোলে,
ডাইনে বাঁয়ে পথ নাই রে, যাও বরাবর চ'লে!
পয়সাকড়ি নেয় না ডোমনি, স্বেচ্ছায় পার করে;
বাইতে যে-জন জানে না, সে ঘুরে ঘুরে মরে।

চর্যা-১৫

শান্তি

স্বয়ং-সংবেদন-স্বরূপ বিচারে
অলখ হয় না লক্ষণ;
সোজা পথে গেল যে-যে, আর হয় না রে
তাদের প্রত্যাবর্তন!
কূলে-কূলে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ো না, মূঢ়,
সোজা পথ এই সংসার–
ভুল পথে তিলার্ধ না যেন রে ঘুরো,

কানাত-মোড়ানো রাজ-দ্বার।
মোহের মায়ার এই মহাসিন্ধুর
না-বুঝিস কূল আর থৈ,
নাও নাই, ভেলা নাই, দেখ যত দূর,
নাথে না শুধাও, পাবে কই।
শূন্য এ পাথারের পরিসীমা নেই,
তথাপি রেখো না মনে দ্বিধা–
অষ্টসিদ্ধিলাভ হবে এখানেই
হামেশা চলিস যদি সিধা।
শান্তি বলেন, বৃথা মরিস না খুঁজে,
তাকাস নে বামে দক্ষিণে;
সোজা পথে অবিরত চল্ চোখ বুজে,
সহজিয়া পথ নে রে চিনে।

চর্যা-১৬
মহীধর

তিনটি পাটে কৃষ্ণ হাতির অশান্ত বৃংহণ,
শুনে, বিষয়-সমেত ভীষণ 'মার'-এর আন্দোলন;
মত্ত গজেশ ছুটে গিয়ে শেষটায়
গগন-প্রান্ত ঘুলিয়ে ফ্যালে তেষ্টায়;
পাপপুণ্যের শক্ত শিকলটি এ
ছিঁড়ে ফেলে, স্তম্ভটি উপড়িয়ে,
গগন-চূড়ায় নির্বাণে মন প্রবেশ করল গিয়ে।
মন মহারস-পানে মত্ত হয়,
তিনটি ভুবন উপেক্ষিত রয়,
পাঁচ বিষয়ের নায়কের যে শত্রু কেউ নয়!
খররবিকিরণে মন গগন-গাঙে সাঁতরায়–
ডুবলে কিছুই যায় না দেখা!–মহীধরে কাতরায়।

চর্যা-১৭
বীণা

সূর্য হ'ল লাউ আর তার হ'ল চন্দ্র,
অবধূতি চাকি হ'ল, অনাহত দণ্ড;
হেরুক-বীণাটি বেজে ওঠে, সখী ও লো,
করুণায় শূন্য-তন্ত্রী বিলসিত হ'ল–
আলি-কালি দুই সুর হ'ল তাতে বন্দি,
গজবর, সমরস বীণাটির সন্ধি।

করতলে করপার্শ্ব চাপ দিলে পরে
বত্রিশ তন্ত্রীতে সব পরিব্যাপ্ত করে–
বজ্রাচার্য নৃত্য করে, দেবী ধরে গান,
বুদ্ধনাটকের তবে হয় অবসান।

চর্যা-১৮

কানু

পার ক'রে দেই তিনটি ভুবন অবহেলায়
সুপ্ত থেকে মহাসুখের মহালীলায়।
ডোমনি রে, তোর ভাবকালির পাই না কোনো ঠিক,
পিছনে তোর কুলীনজন, সঙ্গে কাপালিক!
বিচলিত করলি, ডোমনি, সবকিছুকেই,
চাঁদটিকে তোর টলিয়ে দেওয়ার কারণ তো নেই!
বিরূপা কয় কুলোকে যদিও তোরে,
জ্ঞানী জনে রাখে গলায় মালা ক'রে।
কানু বলে, কামাতুরা রে চণ্ডালী,
তিনভুবনে তুলনাহীন তোর ছিনালি!

চর্যা-১৯

কানু

ভব নির্বাণ, পটহ মাদল;
মন ও পবন, কাঁসি আর ঢোল;
দুন্দুভি বাজে জয়-জয়-রবে,
কানু-ডোমনির আজ বিয়ে হবে।
ডোমনিকে বিয়ে ক'রে জাত গেল,
শ্রেষ্ঠ ধর্ম যৌতুক পেল;
কাটে নিশিদিন সুরত-রঙ্গে,
রজনি পোহায় যোগিনী-সঙ্গে–
যে-যোগী মজেছে ডোমনির পাঁকে
প্রাণ গেলে তবু ছাড়ে না সে তাকে।

চর্যা-২০

কুক্কুরী

হলাম নিরাশ, স্বামী ক্ষপণক, হায়,
আমার বেদনা ভাষায় কওয়া না যায়।
বিয়ালাম গো মা, আঁতুড়ের খোঁজ নাই,

নাই কোনোকিছু, এখানে যা-কিছু চাই।
প্রথম প্রসব আমার, বাসনাপুট,
নাড়িটা কাটতে-কাটতেই, হ'ল ঝুঁট!
পূর্ণ আমার হ'ল নবযৌবন,
ঘটল মায়ের বাপের উৎসাদন।
কুক্কুরী ভনে, এ-জগৎ চির-স্থির,
যে জানে এখানে, সে-ই শুধু হয় বীর।

চর্যা-২১

ভুসুকু

গভীর নিশীথে এখানে ওখানে চ'রে
অমৃতভক্ষ মূষিক আহার করে–
বায়ুরূপী ঐ মূষিকেরে, যোগিবর,
আনাগোনা-রোধকল্পে, ঘায়েল কর্।
চপল মূষিক, মাটি খুঁড়ে থাকে গর্তে,
জেনে তার ঠাঁই, ধাও তাকে বধ করতে।
কৃষ্ণ মূষিক, আঁধারে সে অগোচর,
আনমনা ধ্যানে হ'য়ে যায় সে খেচর,
উড়াম-বা'রাম অস্থির সে-মূষিক
যতখন গুরু না-দেখান তাকে দিক্।
ভুসুকু ভনয়: বিচরণ শেষ হ'লে
সেই মূষিকের সব বন্ধন খোলে।

চর্যা-২২

সরহ

নিজ মনখানি বেঁধে ভবনির্বাণে
মিথ্যাই লোক ফেরে তার সন্ধানে–
অচিন্তনীয় কিছুই জানি না, মন,
কীরূপে জন্ম, কীরূপে হয় মরণ।
জীবনে-মরণে নাই কোনো বিচ্ছেদ,
জীবিতে ও মৃতে নাই রে কোনোই ভেদ।
জন্ম-মৃত্যু-ভয়ে ভরা যার বাসা
সে ক'রে মরুক রসরসায়ন আশা;
ত্রিদশে ভ্রমণ করে যে সচরাচর
কীভাবে কভু-বা হবে সে অজরামর?

কর্মে জন্ম, নাকি সে জন্মে কর্ম?
সরহ বলেন, বড়ই ঘোরালো ধর্ম!

চর্যা-২৩

ভুসুকু

ভুসুকু, তুমি শিকারে গেলে, মারবে পাঁচ জনে,
একাগ্রতা নিয়ে তখন যেয়ো পদ্মবনে।
বিহানে যারা জিন্দা, রাতে তারা মৃত্যুলোকে,
শিকার-বিনা মাংস পেতে ভুসুকু বনে ঢোকে।
মায়াজালের ফাঁদেই মায়া-হরিণ পড়ে মারা–
তারাই বোঝে, সদ্গুরুকে জিগেশ করে যারা।

চর্যা-২৬

শান্তি

তুলা ধুনে ধুনে পাওয়া গেল আঁশ,
আঁশ ধুনে ধুনে আর কিছু নেই,
বোঝা তো গেল না কী যে হেতু তার–
শান্তি বলেন–ভাবো যেভাবেই।
তুলা ধুনে ধুনে খেলাম শূন্যতাকে,
পরে তো হলাম শূন্য নিজেই।
কাদা-ভরা পথ, দু'বার যায় না দেখা,
চুলেরও ঢোকার সামর্থ্য নেই।
কার্য কারণ কিছু নয়, কিছু নয়,
স্বয়ং-সংবেদন এ, শান্তি কয়।

চর্যা-২৭

ভুসুকু

আধেক রাতভর পদ্ম ফোটে রাশি-রাশি,
হ'ল রে বত্রিশ যোগিনী-দেহ উল্লাসী।
চাঁদটা পার হ'য়ে যায় রে অবধূতি-সেতু,
রত্ন গুণে হয় সহজ চির-প্রকাশিত।
নির্বাণের খালে চালানো হ'ল শশধরে,
মৃণালে সরোবর পদ্ম যেরকম ধরে।
বিরমানন্দ যে বিলক্ষণ পরিশুদ্ধ
যে বোঝে এইখানে, কেবল সে-ই হয় বুদ্ধ।

ভুসুকু বলে তবে, পেয়েছি তার সাথে মিলে
সহজানন্দের নিত্য মহাসুখ-লীলে!

চর্যা-২৮

শবর

উঁচু পর্বতে বাস করে এক শবরী বালা,
ময়ূরপুচ্ছ পরনে, গলায় গুঞ্জামালা।
মত্ত শবর, পাগল শবর, কোরো না গোল,
সহজিয়া এই ঘরনিকে নিয়ে দুঃখ ভোল্।
নানা গাছপালা, ডালপালা ঠ্যাকে আকাশ-তলে;
একেলা শবরী কুণ্ডলধারী বনস্থলে।
ত্রিধাতুর খাটে শবর-ভুজগ শেজ বিছায়,
নৈরামনির কণ্ঠ জড়িয়ে রাত পোহায়,
কর্পূরযোগে হৃৎ-তাম্বূল চিবায় সুখে,
আত্মাহীনার আসঙ্গ তার মত্ত বুকে–
গুরুবাক্যের ধনুকের তিরে আপন মন
গেঁথে ফেলে লভো পরিনির্বাণ, পরম ধন।
কোথায় লুকালে, শবর আমার, অন্ধকারে?
খুঁজব তোমাকে কোন্ গিরিখাতে, কোন্ পাহাড়ে?

চর্যা-২৯

লুই

ভাব-ও হয় না, না-যায় অভাবও,
এমন তত্ত্বে কী-বা জ্ঞান পাব?
লুই বলে, বোঝা ভীষণ কষ্ট,
ত্রিধাতু-বিলাসে হয় না স্পষ্ট।
যা-কিছু অরূপ, যা অতীন্দ্রিয়
আগম-বেদে কি তা ব্যাখ্যনীয়?
কী জবাব দেব–জলে বিম্বিত
চাঁদ সে সত্য, নাকি কল্পিত?
লুই বলে, কোনো কিছু নাই জানা,
কই আছি, নাই তারই যে ঠিকানা।

চর্যা-৩০

ভুসুকু

করুণার কালো মেঘ নিরন্তর ফুঁড়ে
ভাব-অভাবের দ্বন্দ্ব যায় ভেঙেচুরে।
আকাশে উদিত এক অতি-অপরুপ!
দ্যাখো রে, ভুসুকু, তার সহজ স্বরূপ।
ইন্দ্রিয়ের জাল টুটে যাবে, জানো যদি,–
মনের গহনে পাবে উল্লাসের নদী।
আনন্দ লভেছি বুঝে বিষয়-বিশুদ্ধি,
চাঁদের আলোর মতো বিকশিত বুদ্ধি;
এ-আলোকই ত্রিলোকের একমাত্র সার–
কেটে গেছে ভুসুকুর মনের আঁধার।

চর্যা ৩১

আর্যদেব

কী জানি কেমন ঘরে ঢুকলুম,
ইন্দ্রিয়-মন হ'য়ে গেল গুম।
করুণা-ডমরু শুধু বেজে যায়,
আর্যদেবের ঠাঁই নিরালায়।
অসংবেদনে ট'লে ঢোকে মন
চন্দ্রকান্তি চন্দ্রে যেমন–
দূর ক'রে ভয়, ঘৃণা, লোকাচার
চেয়ে চেয়ে দেখি শূন্য-বিকার।
ছেড়ে দিয়ে লোকলজ্জা সকল
আর্যদেবের সকলই বিকল।

চর্যা ৩২

সরহ

নাদ নয়, আর বিন্দুও না, সূর্য-চন্দ্র নয়,
চিত্তরাজা স্বস্বভাবে বাঁধন-মুক্ত হয়।
সোজা পথটা সামনে রেখে ধরিস না পথ বাঁকা,
লঙ্কা যা'স না, এই তো বোধি, নিজের মধ্যে ঢাকা!
আয়না নে'য়ার দরকার নাই কাঁকন-পরা হাতে,
নিজের মন না-বুঝলে নিজে, কী আর হবে তাতে?
ওগো যোগী, যাবে যদি ভবনদীর পার,
দুর্জনেরে সঙ্গে নিলে পার পাবে না আর।
ডাইনে-বাঁয়ে ভ'রে আছে নালা ডোবা খাল,
সরহ কয়, বাপু, তোমার সোজা রেখো হাল।

চর্যা-৩৩

ঢেণ্ঢন

টোলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই;
অন্নহীন, নাই তবু ইষ্টির কামাই!
ব্যাঙ কি কামড় মারে সাপের শরীরে?
অথবা দোয়ানো দুধ বাঁটে যায় ফিরে?
বলদে বিয়ায় আর গাভি হয় বন্ধ্যা,
পিঁড়ায় দোয়ানো হয় তাকে তিন সন্ধ্যা–
যে জ্ঞানী সবার চেয়ে, অজ্ঞান সে ঘোর;
সবার চেয়ে যে সাধু, সেই ব্যাটা চোর!
শিয়াল-সিংহের যুদ্ধ চলে অনুক্ষণ–
লোকেরা বোঝে না, তাও বলেন ঢেণ্ঢন।

চর্যা-৩৪

দারিক

শূন্য-করুণা, কায়-বাক্-চিৎ, এই অভিন্নাচারে
বিলাসে দারিক মত্ত হলেন আকাশের পরপারে।
অলক্ষ্যকেই বিলোকন ক'রে, মহাসুখ-অভিসারে
বিলাসে দারিক মত্ত হলেন আকাশের পরপারে।
কী তোর মন্ত্রে, কী তোর তন্ত্রে, কী ধ্যান-ব্যাখ্যানেই?
অপ্রতিষ্ঠ মহাসুখ যদি, নির্বাণ তবে নেই।
দুঃখ ও সুখ সম জ্ঞান ক'রে, ইন্দ্রিয়-উপভোগ,
আপন-পরের ভেদ ভুলে যেতে, দারিক করেন যোগ।
রাজা রাজা রাজা, আছে যত রাজা, সবাই ফক্কিকার–
দ্বাদশ দেশের রাজা এ-দারিক, লুইপাদ গুরু যার।

চর্যা-৩৫

ভদ্র

এতকাল আমি ছিলাম অন্ধ স্বমোহাবেশে,
সদ্গুরু রোগ সারিয়ে দিলেন সদুপদেশে।
এতকাল মন নিমগ্ন ছিল মনের তলে,
আকাশ যেমন ঢ'লে প'ড়ে যায় সাগরজলে।
দশ দিকে ছিল মহাশূন্যের মহা-আঁধার,
এ-মনে ছিল না পাপপুণ্যের কোনো বাধা।
বজ্র আমাকে খাওয়াল সে শেষে মোক্ষফল,
মহাতৃপ্তিতে পান করলাম আকাশজল–

ভাদে বলে, আমি ভাগ্যকে দিয়ে জলাঞ্জলি
নিজ মন খেয়ে, সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে চলি।

চর্যা-৩৬

কানু

তথতার মারে শূন্য বাসনা-আগার,
উজাড় করেছি সব মোহের ভাঁড়ার;
বেঘোর সহজ নিদে উলঙ্গ কানাই,
এই ঘুমে আত্ম-পর ভেদাভেদ নাই,
চেতনা-বেদনা নাই–খুলে আবরণ
সুখময় ঘুমে কানু হ'ল অচেতন।
স্বপনে হেরিনু আমি, শূন্য ত্রিভুবন
গমনাগমনহীন ঘানির মতন–
সাক্ষী জালন্ধরীপাদ–কারণ, আমায়
পণ্ডিতে চেনে না পাশমুক্ত অবস্থায়।

চর্যা-৩৭

তাড়ক

আমিই যদি আমাতে নেই, কীসের তবে ভয়?
মহামুদ্রা লাভের আশা আমার জন্য নয়।
সহজেরে বোঝ্ রে, যোগী, ভুলিস না রে ভবী,
চতুষ্কোটি মুক্ত যেমন, তেম্নি মুক্ত হবি।

যেরকম ইচ্ছা হবে সেরকমই থাকো,
সহজিয়া পথটাকে ভুলে যেয়ো না কো;
মেদ্র ও অণ্ডের ক্রিয়া জাহের, সাঁতারে,
বাতেনি যা, বুঝি কোন্ তরিকায় তারে?
তাড়ক বলেন, বড় গুরু সমস্যাটা,
যারা বোঝে, তাদের গলায় ফাঁস আঁটা।

চর্যা-৩৮

সরহ

দেহরূপ নায়ে বৈঠা মন,
হাল ধরো সদ্গুরুর বচন,
মন স্থির ক'রে ব'সো গো নায়ে,
পারে যাওয়া নাই অন্য উপায়ে।

সহজে নৌকা গুণ টেনে নাও,
হে মাঝি, যেয়ো না আর-কোথাও।
পথে পথে আছে ডাকাতের ভয়,
ভব-দরিয়ার ঢেউয়ে, বিলয়।
কূল ধ'রে, স্রোতে বাইলে উজানে
নৌকা ঢুকবে সোজা আসমানে।

চর্যা-৩৯

সরহ

মন রে, আমার স্বপ্নেও তুই হায়
আপন দোষে আছিস অবিদ্যায়!
মন, কী ক'রে আর গুরুবচন–
বিহারে তুই করবি পর্যটন?
গগনকোণে আজব হুহুঙ্কার–
বঙ্গে জায়া নিয়ে গেলি, আর
বিজ্ঞান তোর হ'ল যে মিসমার!
অদ্ভুত এই ভবের মোহে, মন,
পরকেও তুই দেখিস রে আপন–
জগৎ যেন জলের মুকুর, আত্মা
সহজে হয় শূন্য ও লাপাত্তা।
চিত্ত আমার, নিত্য পরবশ,
বিষ গিলেছিস ফেলে সুধারস।
ঘরে-বাইরে কে আছে কে জানে,
দুষ্ট কুটুম দুঃখ শুধু হানে,
ইচ্ছা লাগে মারতে তাদের প্রাণে–
দুষ্ট বলদ থাকার চেয়ে তবে
শূন্য গোয়াল অনেক ভালো হবে!
একলা থাকি সুখে ও স্বচ্ছন্দে,
জগৎ দূরে যাক–সরহ বন্দে।

চর্যা-৪০

কানু

মনোগোচর যা, তা-ই ধোঁকা,
আগমপুথি, তসবিমালা।
অতীন্দ্রিয় সহজ আমি
ব্যাখ্যা করি কোন্ ভাষাতে?
বৃথাই, গুরু, শিষ্যটিকে

মাথামুণ্ডু চাও বোঝাতে,
কথায় বাড়ে প্রমাদ শুধু–
গুরু সে বোবা, শিষ্য কালা!
কানু বলেন, সহজ এই:
বোবায় বোঝে, বললে কালা।

চর্যা-৪১

ভুসুকু

এ-জগৎ অনুৎপন্ন আদিতে, ভ্রান্তিতে প্রতিভাত।
রজ্জুকে যে সর্প ভাবে তাকে কি কামড়ায় চন্দ্রবোড়া?
অদ্ভুত হে যোগী, মিছা কোরো না তোমার হাত নোনা,
বাসনা টুটবেই, যদি জগতের রীতি বুঝতে পারো।

যেন, মরু-মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, মুকুরের
প্রতিবিম্ব, বাত্যাবর্তে ঘন হ'য়ে শিল-হওয়া জল,
যেন বহুবিধ খেলা খেলে চলে বন্ধ্যার দুলাল–
খেলে খরগোশের শিং, বালুতেল, আকাশকুসুমে–

রাজপুত্র ভুসুকুপা বলে, সব এরকমই বটে,
গুরুর শরণ নাও, যে এখনও আছো ভ্রান্ত পথে।

চর্যা-৪২

কানু

শূন্যে পূর্ণ চিত্ত সহজে,
কাঁধ ভেঙে গেলে দুঃখ নেই;
কানু ম'রে গেছে, তোমরা কহ যে–
সে আছে ত্রিলোকে সবখানেই।
দৃশ্যলোপে যে বুক-দুরুদুরু,
ঢেউ কি কখনও শোষে সাগর?
দেখে না চক্ষু-বিহীন মূঢ়
দুধে-মিশে-থাকা দুধের সর।
আসে না যায় না কেউ এ-ঠাঁই,
এই বুঝে কানু আছে তোফাই।

চর্যা-৪৩

ভুসুকু

ফোটে সহজিয়া মহাতরু ত্রৈলোক্যে।
শূন্য-স্বভাবে বন্ধনহীন নয় কে?
সমরসে মনোরত্ন আকাশে মেশে,
পানিতে যেমন পানি মেশে নিঃশেষে।
পর নাই তার, যার কেউ নাই আপনা;
জন্ম হয় নি যার, সে কখনও মরে না।
ভুসুকু বলেন, প্রকৃতির রীতি এই:
আনাগোনা আর ভাবাভাবে স্থিতি নেই।

চর্যা-৪৪
কঙ্কণ

শূন্যে শূন্য মিললে তবে
সকল ধর্ম উদিত হবে।
অনুখন আছি এ-সংবোধে:
বোধির বিততি মাঝ-নিরোধে।
বিন্দু-নাদ না-ঢোকে হিয়ায়,
একটি চাইলে আরটি যায়!
কোত্থেকে এলে, সেইটে জানো,
মাঝখানে থেকে আঘাত হানো।
ভনে কলকল কাঁকনপাদে,
সবকিছু বুঁদ তথতা-নাদে।

চর্যা-৪৫
কানু

পঞ্চেন্দ্রিয় শাখা মন-তরুটাতে,
আশারূপ ফল পাতা শোভা পায় তাতে।
সদ্গুরু কাটে তরু বচন-কুড়ালে;
কানু বলে, এ-জীবন পাবে না, ফুরালে।
সেই তরু বাড়ে পাপপুণ্যের জলে,
বিদ্বান্ কাটে তারে গুরু-কৃপা-বলে।
তরুটার ছেদ-ভেদ না-জানে যে-বোকা
পৃথিবী সত্য ভেবে খায় সে যে ধোঁকা।
শূন্য সে-তরুবর, আকাশ কুড়াল–
শিকড়ে বসাও কোপ, ছেঁটো না রে ডাল।

চর্যা-৪৬
জয়নন্দী

স্বপ্ন যেমন বহু অদেখা দেখায়
অন্তরে সংসার তেম্নি যে হায়!
শেষ হ'লে হৃদয়ের মোহজাল বোনা
থেমে যায় মন-পথে যত আনাগোনা।
না সে পোড়ে, না সে ভেজে, ছিঁড়েও না মন,
দ্যাখো মায়া-মোহে তার দৃঢ় বন্ধন।
ছায়া-মায়া-কায়া এরা সমান সবাই,
নানা শোভা ধরে তার উভয় পাখাই।
তথতা-সাধনে করো শুদ্ধ হৃদয়,
আর পথ নাই–জয়নন্দী ভনয়।

চর্যা-৪৭

ধর্ম

কমল-কুলিশ মাঝে হলাম মিলিত,
চণ্ডালী সমতা-যোগে হ'ল প্রজ্বলিত।
ডোমনির কুঁড়েঘরে আগুন লেগেছে,
আগুন নেবাই চাঁদ দিয়ে পানি সেচে।
জ্বালা খুব তেজি, তবু কোনো ধোঁয়া নেই,
মেরুশীর্ষ নিয়ে পশে সোজা গগনেই।
পোড়ে ব্রহ্মা, হরিহর, পুড়ে হয় মুক্ত
তামার শাসনপট্ট, নবগুণযুক্ত।
ধামপাদ বলে, আজ সব স্পষ্ট জানি,
পঞ্চনালে উঠে গেল নির্বাণের পানি।

চর্যা-৪৯

ভুসুকু

বজ্রনৌকা বেয়ে পাড়ি দেই পদ্মা খাল,
দেশ লুট ক'রে নিল অদয় বঙ্গাল।
ভুসুকু, বাঙালি হলি আজ থেকে ওরে,
নিজের ঘরনি গেল চাঁড়ালের ঘরে।
জানি না কোথায় ঢুকে মন হ'ল ভ্রষ্ট,
জ্বলন্ত পঞ্চপাটন, ইন্দ্রিয় বিনষ্ট।
সোনা-রুপা কিছু আর রইল না বাকি,
নিজ পরিবারে তবু মহাসুখে থাকি–
নিঃশেষ হয়েছে যদি চৌকোটি ভাঁড়ার
জীবন-মরণে নাই প্রভেদ আমার।

চর্যা-৫০

শবর

গগনে তৃতীয় বাড়ি, হৃদয়ে কুঠার,
কণ্ঠলগ্না রমণীয়া নৈরামনি নারী–
শবর শূন্যতা-সঙ্গে সুখে আছে ভারি
ঝেড়ে ফেলে মায়া-মোহ-দ্বন্দ্ব-দুঃখ-ভার।
মহাশূন্যোপম অই বাড়িটির পাশে
ফুটেছে সুন্দর কত কার্পাসের ফুল,
এলিয়ে দিয়েছে চাঁদ জোছনার চুল,
আকাশকুসুম যেন ফুটেছে আকাশে।
খেতে খেতে পেকে ওঠে চিনা ও কাউন
শবরী শবর মাতে, ভুলে যায় সব;
চার-বাঁশের চেঁচাড়িতে শবরের শব
দাহ করা হয়–কাঁদে শিয়াল-শকুন।
দশ দিশে পিণ্ড পায় মৃত ভবমত্ত,
শবর নির্বাণ লভে, যায় শবরত্ব।

চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা - ড. শামসুল আলম সাঈদ চর্যাপদ : তাত্ত্বিক সমীক্ষা - ড. শামসুল আলম সাঈদ বাঙালি জ্যোতিলব্ধ প্রথম চিত্ত-সম্পদ চর্যাপদ; এমন স্নিগ্ধ সংরক্ষণযোগ্য । চর্যাপদ বৌদ্ধ বজ্রযানি সিদ্ধাচার্যদের সাধন সংগীত, সম্পূর্ণ রূপক ভঙ্গিতে এবং তন্ত্রের মন্ত্র হিসেবে ধর্মশিক্ষার্থীদের জন্য রচিত । উদ্দেশ্য যা-ই থাক, চারদিকেও তার জ্যোতি ও আভা বাদ যায় না । ঠিক তেমনি তান্ত্রিক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেও চর্যাপদের সম্মোহনীয় পদ্মশ্রীর রূপস্পর্শে আকুলিত হয় না এমন কেউই নেই, সেখানেই চর্যাপদের কৃতিত্ব। কবিতা যে উদ্দেশ্যে লেখা হোক না কেন, যদি তা হয় হৃদয় নিঃসৃত শিল্পানুরাগে জারিত তবে কবিতা কবিতাই । বৌদ্ধ গান চর্যাপদ তাই আমাদের সেই উৎকৃষ্ট সুরভিত কবিতা এবং আস্বাদনের বিষয় । পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন । সেখানে রাজকীয় পরিবেশে সমাদরে তা গৃহীত হয়েছিল হয়তো-বা বাংলার বৌদ্ধ জীবন-মননে তার ঠাই ছিল না বলে । তাই মাজা-ঘষার দরুন বঙ্গীয় রূপ-লাবণ্য কিছুটা ছিন্ন বা ফিকে হয়ে গেলেও পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আপ্রাণ চেষ্টায় চর্যাপদে বাংলার প্রাচীনত্ব যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত এবং বাংলার আদি সাহিত্যভাষার নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়। বর্তমান সমীক্ষায় সেই উদ্দেশ্য সামঞ্জস্য রেখেও চর্যাপদের কবিতায় যে জগৎ এবং জীবনের অনুপম তাত্ত্বিক সৌকর্য সম্ভার লুকিয়ে তা উদ্ধার করার প্রয়াস রয়েছে। ভূমিকা চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম প্রাণস্পন্দন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একশত বছর আগে নেপালের রাজদরবার থেকে একে বের করে এনে বিশ্ব দরবারে হাজির করার পরপরই পূর্ব ভারতীয় অন্যান্য ভাষা দাবি করল যে এটাই আসলে তাদের সকলের পূর্বেকার সঠিক প্রাণ। কিন্তু ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেসব দাবি নাকচ করে বললেন, এটা বাংলার। সঠিক এবং তাই সত্য কথা । এত বলবীর্য সম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্য কীর্তি বঙ্গ জননী হাজার বছর আগে প্রসব করেছিল, তবে জননীর কোল ছেড়ে কী অভিমানে তা অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তার কারণ এখনও নিণীত হয় নি এবং মাঝখানে বঙ্গ সাহিত্য ভাষার গ্রন্থিসূত্র এতটাই ছিন্ন

হয়েছিল যে একমাত্র মাঠে ঘাটে অনাদরে থাকা বাউলরা কেবল একতারে যেটুকু পারে ধরে রেখেছিল, নইলে চর্যাপদকে বাংলা বলার কথা নয়। তাছাড়াও চর্য যে বাংলা পদ সাহিত্যের ঐতিহ্য পদাবলী তার চর্চাও তাই বলে দিচ্ছে। কিন্তু চর্য রচয়িতা সিদ্ধাচার্যরা কিন্তু একে পদ বলেন নি, এ পদগুলো কেবল চর্যা নামে অভিহিত, যা সিদ্ধাদের মন্ত্রধ্বনি বা সাধন সংগীত। বৌদ্ধ বজ্রযানি তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যরা আপন আপন গুহ্য আচারের নিমিত্ত এ চর্যা ব্যবহার করতেন আগম নিগম রূপে, সাধারণের জন্য নয়। টীকাকার মুনিদত্ত তাই চর্যার ভাষাকে প্রাকৃত-সান্ধ্য ভাষা বলেছেন অর্থাৎ একটা আশ্চর্য মরমি ভাষা, যা সাধারণের বোধগম্য নয়। তাই বোধগ্রহীদের জন্য টীকা নির্মাণ করেন। এ রকম চর্যা বাংলা বৌদ্ধ বিহারগুলোতে কিংবা অন্যত্র 'লোকজ্ঞানলোকভাসের নিমিত্ত নৃত্য গীত রাগ তাল লয় সহকারে গীত হত। বাংলার বুক থেকে বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হবার পর এ অমর সম্পদও অন্যত্র অপসারিত হয়েছে, অবশেষে হিমালয়ের ভেতরে গিয়ে যতটা সম্ভব অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। চর্যার ভেতরে বঙ্গ নামের উল্লেখ থাকলেও ভাষার নাম তখনও বঙ্গ হয়ে ওঠে নি, অথবা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ সবকে মিলে তৎকালে বঙ্গই বলা হত, এ সমগ্র অঞ্চলের ভাষাটাই ছিল পূবী প্রাকৃত বা চর্যার ভাষা, বর্তমান বাংলাভাষায় মূলরোম অন্য ভাষাগুলো তা থেকে গেড় পেয়েছে। এ ভাষাতে দেড় হাজার কি তারও আগে এ রকম চর্য রচিত হত বলে অনুমান করা যায়। হাজার হাজার আগাছা চর্য সৃষ্টির পর এ চর্যার মত মহীরুহ উৎপন্ন হয়েছে, যা হঠাৎ করে এ অঞ্চলে জেগে ওঠে নি। টীকাকারের মন্তব্যে ধরা পড়ে যে এ সব হাজার হাজার চর্য সংগ্রহের পর তার থেকে নির্বাচিত একশতটি চর্যার একটি সংকলন হয়েছিল, তার ভেতর থেকে মুনিদত্ত মাত্র একান্নটি, পরে একটি ব্যাখ্যা নাস্তি' বলে বাদ দিয়ে পঞ্চাশটির নির্মল টীকা প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীদের জন্য, সেই টীকাযুক্ত চর্যগ্রন্থের নাম হল চর্যাগীতিকোষবৃত্তি যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন এবং এ চর্য্যাচর্য্যাচয়' কে তিনি নামকরণ করেন চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়', প্রকৃতপক্ষে এর নাম আশ্চর্য্য-চর্য্যাচয়'। 'আশ্চর্য-মরমি ভাষা ও কথার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ শাস্ত্রী চর্যার ভাষাকে সান্ধ্য বা আলো আঁধারি ভাষা বলেছেন, যা ঠিক নয়। মুনিদত্তের টীকা অনুসরণে চর্যার ভাষাকে দুর্বোধ্য বলার অবকাশ নেই। চর্যাপদ বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একে এখন আর মন্ত্র বা সাধন সংগীত বলে একপেশে আচরণ দিয়ে বিচার করার প্রয়োজন নেই, এখন নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান প্রসারিত হয়েছে, চর্যার শব্দ ও ভাষার অর্থভেদ করার মত চিন্তা চেতনা যুক্তি ও মুক্ত মননের উদয় হয়েছে যা নিয়ে অনুধাবন করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে চর্যাপদ বাংলা কবিতার এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং এর ভাব ব্যঞ্জনা শব্দ অনুষঙ্গ আধুনিক কবিতাকেও অতিক্রম করার শক্তি রাখে। সেই সময়ের চর্য রচয়িতা এ সকল সিদ্ধাচার্য বা রাজপুত্র কী অমোঘ ভঙ্গিতে এ বাণী সমিধ উচ্চারণ করে গেছেন ভাবতে অবাক লাগে, যার গোপন গন্ধের চারিদিকে বাঙালি চিরদিন অবশ্য ঘুরে বেড়াবে। চর্যাগীতি আমাদের অহংকার, বাংলা গানের প্রথম ঘরানা তো এখানেই। এ মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণ করতেন ঈশ্বরের মত শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধাচার্যরা। তারা তাকে মার্গ সংগীত বা সাধন সংগীত হিসেবে চর্চা করতেন। বাংলা গানের এই নামের ঈশ্বরদের গুণ এমনই যে তারা একাধারে বাণী রচনা করতেন, সুর সংযোজন করতেন, রাগ তাল নির্ণয় করতেন এবং অবশেষে নিজের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরে প্রকাশ করতেন, সেই একই ধারায় বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদের বৈভব থেকে শুরু করে এই সেদিন পর্যন্ত রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত বাংলা সংগীত সম্ভারে জমা পড়েছে। এ রকম সৃষ্টিকে কেউ গানবাধা সাধনা বলেছেন, তাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজস্ব ঘরানা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এর পর থেকে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী আলাদা-আলাদা ভাবে তাদের প্রতিভার বিস্তার করে থাকে, তাই আধুনিক গানকে আর মার্গ সংগীত বলা যাচ্ছে না। লোকসংগীতের মত ব্যাপারটা এর জন্য অচেনা রূপকারদের কাজ হিসেবেই থেকে যাচ্ছে, আগের মার্গ গৌরব অর্জন এরা করতে পাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় চর্যাগীতি

হল বাংলা গানের বা বাণীর মাতৃস্তন্য, যা পান করে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি ও বাঙালির জীবনবোধ বর্ধিত হয়েছে। চর্যাপদ নিয়ে দীর্ঘদিন দানাপানি ছেড়ে মাঠে প্রান্তরে মগ্ন থেকে কবিতা হিসেবে এগুলোকে আস্বাদন করতে গিয়ে অতি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে যারা এ শব্দ ভাষানুষঙ্গ ও বাণীর রূপকার ছিলেন, মনে হয়েছে তারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরই ছিলেন, তা না হলে আধুনিক কাব্যগুণের ব্যাপারগুলো কী করে তারা জানতে পারলেন? তবে মাঝখানে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুনিদত্ত যে এর জন্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চেপে কাব্যরস পিপাসাকে আলগা করে দিয়েছেন একথা ভুলে যেতে হবে। অথচ তিনিই চর্যাপদকে নবজীবন দান করেছেন। বর্তমান গ্রন্থচর্চায় আধুনিক পাঠক হয়তো এ দায়িত্বটা উদ্ধার করতে পারেন, তবু তা সন্দেহ নিশ্ছিদ্র নয়। মনে করছি এ জন্য যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানুষ জঙ্গিবাদের জন্য ধর্মদায় মোচন করছে, গির্জায় মঠে মন্দিরে তাদের গগন বিস্ফারিত সত্য নয় কে বলতে পারে? এ মহাশক্তিবলেই তো চর্যাশক্তি উৎসারিত হয়েছে। অবশ্য আমাদের বিস্ময় যে নেওয়ারি দুর্বোধ্য লিপি থেকে জননীর প্রথম জাতককে কেমন করে উদ্ধার করলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী? এ সব কিছু ঈশ্বরের কাজ-এমনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। আর এ বিশ্বাসাপ্লুত হয়ে এ গ্রন্থ রচনা আর পাঠকই তার দায় মোচন করতে পারেন। ঢাকা শামসুল আলম সাঈদ

Read more books at: http://www.amarboi.com/2013/11/charyapad-tattwic-samiskha-shamsul-alam-sayed.html
via @amarboi www.amarboi.com

চর্যাপদ", বাঙলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ।

লিখেছেনঃ অন্ধকারের যাত্রী >> সময়: মঙ্গল, 03/12/2013 - 11:35অপরাহ্ন

বাঙলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। *চর্যাপদ* হচ্ছে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ বা গ্রন্থ। এটি রচিত হয়েছিলো দশম শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে [৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ] তারপর আসতে আসতে বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ হতে থাকে, আমরা সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকি, এর একটি কবিতা আর একটি গদ্য। বাঙলা সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ কবিতা; ১৮০০ সালের আগে বাঙলা সাহিত্যে গদ্য বিশেষ ছিলোই না। এতোদিন ধরে রচিত হয়েছে কেবল কবিতা। কবিতার মাঝেই লেখা হয়েছে বড়ো বড়ো কাহিনী, কবিতার ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে দিয়েছিলো সব। *চর্যাপদ*-এর আরও কয়েকটি নাম আছে কেউ বলে...*চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়,* আবার কেউ বলে...*চর্য্যাশ্চর্য্যাবিনিশ্চয়*। বড়ো শক্ত এই নাম গুলো। তাই এটিকে আজকাল যে মনোরম নাম ধরে ডাকা হয়, তা হচ্ছে *"চর্যাপদ"*। বেশ সহজ ও সুন্দর নাম। বইটি যদিও অনেক আগে রচিত হয়েছিলো, কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকেও কেউ এই বইয়ের কথা জানতো না। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই বছর যান নেপালে। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কার করে তিনি নিয়ে আসেন কয়েকটি বই। এর মধ্যে একটি হচ্ছে *"চর্যাপদ"* । ১৯১৬ খ্রিস্তাব্দে নেপাল থেকে আনা চর্যাপদ সহ আরও দুইটি বই--ডাকার্নব ও দোহাকোষ মিলিয়ে একসাথে হাজার বছরের পুরান বাঙলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা (১৩২৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এ-বই বেরোনোর সাথে সাথে সারা দেশে সাড়া পরে যায়, সবাই বাঙলা ভাষার আদি নমুনা দেখে বিস্মিত চকিত বিহ্বল হয়ে পরে। শুরু হয় একে নিয়ে আলোচনা আর আলোচনা। বাঙলা পণ্ডিতেরা চর্যাপদকে দাবি করেন বাঙলা বলে। কিন্তু এগিয়ে আসেন অন্যান্য ভাষার পণ্ডিতেরা। অসমীয়া পণ্ডিতেরা দাবি করেন একে অসমীয়া ভাষা বলে, ওড়িয়া পণ্ডিতেরা দাবি করে একে ওড়িয়া বলে। মৈথিলিরা দাবি করে একে মৈথিল ভাষা আদিরূপ বলে, হিন্দিভাষীরা দাবি করেন হিন্দি ভাষা আদিরূপ বলে। একে নিয়ে সুন্দর কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।..আসলে কার ভাষা?? এগিয়ে

আসেন বাংলার সেরা পণ্ডিতেরা। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরিজিতে একটি ভয়াবহ বিশাল বই লিখেন বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ (১৯২৬) নামে এবং প্রমান করেন *চর্যাপদ* আর কারো নয়, বাঙালির। চর্যাপদ-এর ভাষা বাঙলা। আসেন ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। তাঁরা ভাষা, বিসয়বস্তু, প্রভৃতি আলোচনা করে প্রমান করেন *চর্যাপদ* বাঙলা ভাসায় রচিত; এটি আমাদের প্রথম বই। চর্যাপদ জ্বলে উঠে বাঙলা ভাষার প্রথম প্রদীপের মতো।

চর্যাপদ কতোগুলো পদ বা কবিতা বা গানের সংকলন। এতে আছে ৪৬টি পূর্ণ কবিতা এবং একটি ছেঁড়া খণ্ডিত কবিতা। তাই এতে কবিতার রয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি। এ-কবিতাগুলো লিখেছেন ২৪ জন বৌদ্ধ বাউল কবি, যাঁদের ঘর ছিল না, বাড়ি ছিলো না; সমাজের নিচুতলাত আধিবাসি ছিলেন আমাদের ভাষার প্রথম কবিরা। কবিদের নামও কেমন যেন...কাহ্নপাদ, সরহপাদ, চাটিল্লপাদ, ডোম্বিপাদ, ঢেন্টপাদন, শবরপাদ। সবার নামের শেষে আছে 'পাদ' শব্দটি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন কাহ্নপাদ। কাহ্নপাদের অন্য নাম কৃষ্ণাচার্য। তার লেখা কবিতা পাওয়া গেছে ১২টি। ভুসুকপাদ লিখেছেন ৬টি কবিতা, সরহপাদ লিখেছেন ৪টি কবিতা, কুক্কুরিপাদ ৩টি; লুইপাদ, শান্তিপাদ, শবরপাদ লিখেছেন দুটি করে কবিতা, বাকি সবাই লিখেছেন ১টি করে কবিতা।

এ-কবিতাগুলো সহজে পড়ে বোঝা যায় না; এর ভাষা বুঝতে কষ্ট হয়, ভাব বুঝতে হিমশিম খেতে হয়। কবিরা আসলে কবিতার জন্যে কবিতা রচনা করেন নি; এজন্যেই এতো আসুবিধা। আমাদের প্রথম কবিরা ছিলেন গৃহহীন বৌদ্ধ বাউল সাধক। তাঁদের সংসার ছিলো না। তাঁরা সাধন করতেন গোপন তত্ত্বের। সে-তত্ত্বগুলো তাঁরা কবিতায় গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে একমাত্র সাধক ছাড়া আর কেউ তাঁদের কথা বুঝতে না পারে। কিন্তু এ-কবিতাগুলোতে শুধু ধর্মের কথাই নাই, আছে ভালো কবিতার স্বাদ। আছে সেকালের বাঙলা সমাজের ছবি, আছে গরীব মানুষের বেদনার কথা, রয়েছে সুখের উল্লাস।

একটি কবিতায় এক দুঃখী কবি তার সংসারের অভাবের ছবি এতো মর্মঅস্পর্শী করে এঁকেছেন যে পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হয়। কবির ভাষা তুলে দিচ্ছিঃ

টালতে মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।
বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ।
দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামায়।

কবি বলেছেন, টিলার উপরে আমার ঘর, আমার কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে আমার ভাত নেই, আমি প্রতিদিন উপোস থাকি। বেঙ্গের মতো প্রতিদিন সংসার আমার বেড়ে চলছে, যে-দুধ দোহানা হয়েছে তা আবার ফিরে যাচ্ছে গাভীর বাঁটে। এমন অনেক বেদনার কথা আছে *চর্যাপদ*-এ, আছে সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকের অত্যাচারের ছবি। তাই কবিরা সুযোগ পেলেই উপহাস করেছেন ওই সব লোকের। শ্রেণিসংগ্রামের জন্যে রচিত হয় সাহিত্য। বাঙলা সাহিত্যে শ্রেণিসংগ্রামের সূচনা হয়েছিলো প্রথম কবিতাগুচ্ছেই। বাঙলা কবিতায় ১৮০০ সালের আগে যা কিছু রচিত হয়েছে সবই রচিত হয়েছে গাওয়ার উদ্দেশ্যে *চর্যাপদের* কবিতা গুলোও গাওয়া হতো। তাই এগুলো একই সাথে গান ও কবিতা। বাঙালির প্রথম গৌরব এগুলো।

হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি যুগে, যেমনঃ

[ক] প্রাচীন যুগ ৯৫০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত ।

[খ] মধ্যযুগ ১৩৫০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত ।

[গ] আধুনিক যুগ ১৮০০ থেকে আজ পর্যন্ত ।

এই-তিন যুগের সাহিত্যই বাঙলা সাহিত্য, কিন্তু তবু বিষয়বস্তুতে, রচনারীতিতে এ-তিন যুগের সাহিত্য তিন রকম। প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় একটি মাত্র বই, যার নাম *চর্যাপদ*। এর পর দেড়শো বছর বাঙলা ভাষার আর কিছু রচিত হয় নি। কালো ফসলশুন্য এ-সময়টিকে [১২০০ থেকে ১৩৫০] বলা হয় 'অন্ধকার যুগ' কেননা এই সময়ে আমরা কোন সাহিত্য পাই নি। অন্ধকার যুগের পরে পুনরায় প্রদীপ জ্বলে, আসে মধ্যযুগ। এ-যুগটি সুদীর্ঘ। এ-সময়ে রচিত হয় অসংখ্য কাহিনিকাব্য, সংখ্যাহীন গীতিকবিতা; মানুষ আর দেবতার কথা গীত হয় একসাথে। আগের মতো সাহিত্য আর সীমাবদ্ধ থাকে নি, এর মধ্যে দেখা দেয় বিস্তার। এর ফলে সাহিত্যে স্থান পায় দেবতা ও দৈত্য, মানুষ ও অতিমানুষ; আসে গৃহের কথা, সিংহাসনের কাহিনী। এ-সময়ে যারা মহৎ কবি, তাঁদের কিছু নামঃ বড়ু চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, আলাওল, কাজী দৌলত। মধ্যযুগের একশ্রেণীর কাব্যকে বলা হয় *'মঙ্গলকাব্য'*। এগুলো বেশ দীর্ঘ কাব্য। কোন দেবতার মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠার কাহিনী এগুলোতে বলেন কবিরা। এজন্যে মঙ্গলকাব্য দেবতার কাব্য। মধ্যযুগের সকল সাহিত্যই দেবতাকেন্দ্রিক, মানুষ সে-সময় প্রাধান্য লাভ করে নি। মানুষের সুখদুঃখের কথা এসেছে দেবতার কথাপ্রসঙ্গে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা দেবতার ছদ্মবেশে এ-সব কাব্য জুরে আছে মানুষ।

মধ্যযুগের অবসানে আসে আধুনিক যুগ, এইতো সেদিন, ১৮০০ অব্দে। আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড়ো অবধান গদ্য। প্রাচীনযুগে, মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে গদ্য বলতে বিশেষ কিছু ছিলো না। তখন ছিলো কেবল কবিতা বা পদ্য। তখন গদ্য ছিলো না; গদ্যসাহিত্য ছিলো না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকরা সুপরিকল্পিতভাবে বিকাশ ঘটান বাঙলা গদ্যের। তাঁদের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি। কেরির সহায়ক ছিলেন রামরাম বসু। উনিশশতকের প্রথম অর্ধেক কেটেছে সদ্য জন্মনেয়া গদ্যের লালনপালনে। বিভিন্ন লেখক নিজ ভঙ্গিতে গদ্য রচনা করেছেন, আর বিকশিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্য। সে সময় যারা প্রধান গদ্যলেখক, তাঁরা হচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত। গদ্যের সাথে সাহিত্য আসে বৈচিত্র্য; উপন্যাস দেখা দেয়, রচিত হয় গল্প নাটক প্রহসন প্রবন্ধ আরো কতো কি। প্রথম উপন্যাস লেখেন প্যারীচাঁদ মিত্র; উপন্যাসের নাম *আলালের ঘরের দুলাল* মহাকাব্য রচনা করেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। নাম *মেঘনাদবদকাব্য*। মধুসূদন দত্ত আধুনিক কালের একজন মহান প্রতিভা। তার হাতে সর্বপ্রথম আমরা পাই মহাকাব্য ও সনেট, পাই ট্রাজেডি, নাম *কৃষ্ণকুমারীনাটক*। পাই প্রহসন নাম *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা*। এরপরে আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ। তারপর আসেন মোহিতলাল মজুমদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনান্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কত প্রতিভা। তাঁরা সবাই বাঙলা সাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন। আজও আমাদের বাঙলা সাহিত্য এগিয়ে যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞতায়ঃ শ্রদ্ধেয় ডঃ হুমায়ূন আজাদ স্যার।

চর্যাপদ: ভাষা ও বাঙালি সমাজ

- মহীদুল ইসলাম | ২০১৫-০৮-০৭ ইং
-
-
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ। এতে বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রথম পরিচয় বিধৃত। ১৯০৭ সালের আগ পর্যন্ত চর্যাপদ আমাদের জানার বাইরেই ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর আবিষ্কারক। নেপালের রাজদরবার থেকে তিনি এটি আবিষ্কার করেন। এর পরই নানা ভাষাভাষীর পণ্ডিতরা হুড়মুড়িয়ে পড়েন চর্যাপদের ভাষা বিচারে; পাশাপাশি সমাজতত্ত্ব নিয়েও ব্যাপক গবেষণা চালান তারা। বাংলা ভাষায় যারা চর্যাপদ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম না বললেই নয়। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শশীভূষণ দাশগুপ্তও এ বিষয়ে কমবেশি আলোকপাত করেছেন। যারা চর্যাপদ রচনা করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কিংবা সাহিত্যচর্চা অথবা সমাজ বিনির্মাণ। তার পরও এক প্রকার অজান্তেই চর্যাপদে বাংলা ভাষা ও সমাজের রূপকার হিসেবে তারা আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমাদের সামনে রেখে গেছেন এক অনন্য গৌরবের কীর্তি।

- চর্যাপদের ব্যাকরণগত পরিচয়: চর্যাপদ সাধারণত এক ধরনের সাধনসংগীত, যা পালাগান আকারে রচিত। এতে ৫১টি পদ এবং ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধসহজিয়ারা যখন চর্যাপদ রচনা করেন, অর্থাত্ ধর্মীয় আঙ্গিকে যখন তাদের কীর্তনগুলো প্রচার হতো, তখন বাংলা ভাষার সবে জন্ম। এ সময় অসমিয়া, মৈথিলি প্রভৃতি ভাষারও জন্মসূচনা কাল। ফলে পাশাপাশি চলতে গিয়ে চর্যাপদে ছিটেফোঁটা সেসব ভাষার কিছু শব্দের মিশ্রণ ঘটে যেতে পারে। যে কারণে অন্য ভাষার লোক চর্যাপদকে তাদের সাহিত্য বলে দাবি করে আসছিল। ফলে চর্যাপদ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেসব দাবি নাকচ করতেই ড. সুনীতি কুমার তার The Origin and Development of the Bengali language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদের ধ্বনিতত্ত্ব, ছন্দ ও রূপতত্ত্ব বিচার করে একে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন বলে মত দিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও একই মত প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বাংলায় যেমন কারক-বিভক্তি-ক্রিয়া-পদের ব্যবহার হয়, চর্যাপদেও তার প্রচলন ঘটান পদাকাররা। যেমন: (ক) কারকের ব্যবহার— 'সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগইঅ।' (খ) আধুনিক কবিতার মতো চরণান্তে মিল: 'তইলা বাড়ীর পায়েঁ রে জোহ্না বাড়ী তাএলা।'
- ... ...
- 'অনুদিন সবরো কিম্পি ণ চেবই মহাসুহেঁ মাতেলা।'
- (গ) সম্বন্ধ পদে— 'অর' বিভক্তি, সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। পদাকাররা অবশ্য সচেতনভাবে ব্যবহার করেন বলেই ধরা যায়। চর্যায় স্ত্রীলিঙ্গ, পুলিঙ্গের পার্থক্য ছিল না। জ, য, শ, স, ষ এসব ধ্বনির বিশেষ পার্থক্য করা হয়নি। একজন পদাকারের নাম 'সবর'। তার নাম কখনো 'শবর' পাওয়া যায়। সুতরাং ভাষার যে সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে আমাদের বাংলা ভাষার সূতিকাগার যে চর্যাপদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
- সামাজিক প্রেক্ষাপট
- চর্যাপদে বৌদ্ধসহজিয়াদের সাধনসংগীতের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক, জীবিকানির্বাহ, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।
- ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদে সমসাময়িক (অনার্য) তুচ্ছ নিচু শ্রেণীর মানুষের জীবনাচার ও সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এদের অনার্য শ্রেণী বলা হয়। উঁচু শ্রেণী থেকে তাদের বাস দূরে, পাহাড়ের টিলায়। ২৮ নং চর্যায়—
- 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
- মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।
- ১০ নং পদে— টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
- ..... নিতি আবেসী। অর্থাত্ টিলার ওপর ঘর। যেখানে তার কোনো প্রতিবেশী নেই। লোকালয় থেকে যে দূরে তাদের বাস— এ কথাই প্রমাণ করে এ পদ। আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না এসব অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যের। কখনো কখনো পতিতাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তাদের অধরা। পশু শিকার করে জীবিকা অর্জনের পরিচয় পাওয়া যায় ৬ নং চর্যায়— কাহেরে ভিনি মেলি আছহ কীম

- .....
- আপনা মাংসে হরিণা বৈরী
- ..... ভসুকু আহেরী।
-
- চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল তখন, সে বর্ণনাও এসেছে—
- ৪৯ নং চর্যায়— বাজ ণাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
- অদঅ বঙ্গাল দেশ লুড়িউ।
- ২ নং চর্যায়— 'কানেট চোরে নিল অধরাতী'।
-
- নটবৃত্তি— ২ নং চর্যায়— দিবসহি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাই।
- রাতি ভইলে কামরু জাই।
- এখানে দিনে বধূ কাকের ভয়ে ভীত; অথচ রাতে কামরূপ চলে যায়।
- গো-পালন, দাবা খেলা, নাচ-গান, আনন্দফুর্তি ও মদ তখন নিত্য অভাব-অনটনের মধ্যেও যোগী-কাপালী তথা বৌদ্ধসহজিয়াদের জীবনে মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে।
- রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ এক ভিন্নধর্মী মানুষের, ভিন্ন স্বাদের এক জীবনাচারের তত্ত্ব ফুটে উঠেছে চর্যাপদে। বর্তমান গ্রাম্য, এমনকি শহুরে বাঙালি জীবনের সঙ্গে চর্যায় বিধৃত জীবনাচারের মিল খুঁজে পাওয়া যায় খানিক

চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্য তথা সাহিত্য নিদর্শন। নব্য ভারতীয় আর্যভাষারও প্রাচীনতম রচনা এটি। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতিপদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পদগুলি রচনা করেছিলেন। বাংলা সাধন সংগীত শাখাটির সূত্রপাতও হয়েছিলো এই চর্যাপদ থেকেই। এই বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। একই সঙ্গে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলিতে উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণ আজও চিত্তাকর্ষক। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যার একটি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে চর্যাপদের সঙ্গে বাংলা ভাষার অনস্বীকার্য যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চর্যার প্রধান কবিগণ হলেন লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদ প্রমুখ।

বাংলায় মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজের পীড়নে এবং মুসলমান শাসনে ধর্মচ্যুত হবার আশংকায় বাংলার বৌদ্ধগণ তাঁদের ধর্মীয় পুঁথিপত্র নিয়ে শিষ্যদেরকে সঙ্গী করে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে পলায়ন করেছিলেন– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চারবার নেপাল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৭ সালে বৌদ্ধ লোকাচার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি প্রথমবার নেপাল ভ্রমণ করেন। ১৮৯৮ সালের তার দ্বিতীয়বার নেপাল ভ্রমণের সময় তিনি কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল ভ্রমণকালে

চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক একটি পুঁথি নেপাল রাজদরবারের অভিলিপিশালায় আবিষ্কার করেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোহা এবং অদ্বয় বজ্রের সংস্কৃত সহজাম্নায় পঞ্জিকা, কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদের দোহা, আচার্যপাদের সংস্কৃত মেখলা নামক টীকা ও আগেই আবিষ্কৃত ডাকার্ণব পুঁথি একত্রে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (শ্রাবণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধগান ও দোঁহা শিরোনামে সম্পাদকীয় ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মোট ৪৬টি পূর্ণাঙ্গ ও একটি খণ্ডিত পদ পেয়েছিলেন। পুঁথিটির মধ্যে কয়েকটি পাতা ছেঁড়া ছিল। প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার যে তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করেন তাতে আরও চারটি পদের অনুবাদসহ ওই খণ্ডপদটির অনুবাদও পাওয়া যায়। মূল পুঁথির পদের সংখ্যা ছিল ৫১। মূল তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মূল পুঁথির নাম চর্যাগীতিকোষ এবং এতে ১০০টি পদ ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিটি চর্যাগীতিকোষ থেকে নির্বাচিত পুঁথিসমূহের সমূল টীকাভাষ্য।

আবিষ্কৃত পুঁথিতে চর্যা-পদাবলির যে নাম পাওয়া যায় সেটি হলো 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে এই নামটিই ব্যবহার করেছেন, সংক্ষেপে এটি ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’ বা ‘চর্যাপদ’ নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। কিন্তু আবিষ্কৃত পুঁথিটি যেহেতু মূল পুঁথি নয়, মূল পুঁথির নকলমাত্র এবং মূল পুঁথিটি (তিব্বতি পুঁথি) যেহেতু এপর্যন্ত অনাবিষ্কৃত, সেই কারণে পরবর্তীকালে চর্যা-পদাবলির প্রকৃত নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চর্যার প্রথম পদের সংস্কৃত টীকাটি (শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্যচর্যাচয়ে। সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মল গিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটনম।।) উদ্ধৃত করে শ্লোকাংশের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটিকে গ্রন্থনাম হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে, 'আশ্চর্যচর্যাচয়' কথাটিই নেপালী পুঁথি নকলকারীর ভুলবশত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' হয়েছে। তবে এই মতের যথার্থতা বিষয়ে আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ওই একই সূত্র ধরে চর্যা-পুঁথির নাম 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত খণ্ডন করে লিখেছেন, "'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামটিও অযুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ও 'আশ্চর্যচর্যাচয়', দুই নামকে মিলিয়ে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামটি গ্রহণ করা যায় না। কারণ এই 'জোরকলম' শব্দটি আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত।”

আধুনিক গবেষকগণ তেঙ্গুর গ্রন্থমালা (Bastan-hgyar) থেকে অনুমান করেন মূল পুঁথিটির নাম ছিল চর্যাগীতিকোষ এবং তার সংস্কৃত টীকাটি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' — অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মত গ্রহণ করেছেন।

চর্যার রচনার সময়কাল নিয়েও ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই সময়কালকে আরও ২০০ বছর পিছিয়ে দিয়ে চর্যার রচনাকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (৯৮০ – ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দ) তিব্বত যাত্রার পূর্বে (১০৩০ খ্রিস্টাব্দ) লুইপাদের অভিসময়বিহঙ্গ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। একথা সত্য হলে লুইপাদ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান থাকবেন। অপরদিকে তিব্বতি কিংবদন্তী অনুসারে তিনিই সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু; অর্থাৎ, চর্যার সময়কালও দশম শতাব্দীর পূর্বে হতে পারে না।

অন্যদিকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা নামে এক বৌদ্ধতান্ত্রিক পুঁথির সন্ধান মেলে, যেটির রচনাকাল শেষ পালরাজা গোবিন্দপালের (১১৫৫ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকাল। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পুঁথির রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণাচার্যই প্রকৃতপক্ষে চর্যার কাহ্নপাদ বা চর্যা-টীকার কৃষ্ণাচার্য। নাথ সাহিত্য অনুযায়ী কাহ্নপাদের গুরু জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা, যিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। আবার মারাঠি গ্রন্থ জ্ঞানেশ্বরী (রচনাকাল আনুমানিক ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা জ্ঞানদেব দীক্ষালাভ করেন নিবৃত্তিনাথের কাছ থেকে, যিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য গেইনীনাথ বা গোয়নীনাথের থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সেই হিসাবেও কাহ্নপাদকে দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ বলে মনে হয়।

এইসব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে চর্যার পদগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বলেই অনুমিত হয়। তবে তার পরেও দু-তিনশো বছর ধরে গোপনে চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে এই ধরণের শতাধিক পদ উদ্ধার করেছেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। এগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নব চর্যাপদ নামে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়।

সংবিধানের সূচী

প্রস্তাবনা

প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র

১. প্রজাতন্ত্র, ২. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, ২-ক, রাষ্ট্রধর্ম, ৩. রাষ্ট্র ভাষা, ৪. জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক, ৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি, ৫. রাজধানী, ৬. নাগরিকত্ব, ৭. সংবিধানের প্রধান্য,৭ক,সংবিধান বাতিল,স্থগিত করা ইত্যাদি অপরাধ,৭খ,সংবিধানে মৌলিক বিধানগুলো সংশোধন অযোগ্য।

দ্বিতীয় ভাগঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৮. মূলনীতিসমূহ, ৯.জাতীয়তাবাদ, ১০. সমাজতন্ত্র, ১১. গণতন্ত্র, ১২. ধর্ম নিরপেক্ষতা, ১৩. মালিকানার নীতি, ১৪. কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি, ১৫. মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, ১৬. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিবিপ্লব, ১৭. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ১৮. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা,১৮ক,পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ,১৯. সুযোগের সমতা, ২০. অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম, ২১. নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য, ২২. নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ২৩. জাতীয় সংস্কৃতি,২৩ক,উপজাতি,ক্ষুদ্র জাতিসত্তা,নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ২৪. জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি, ২৫. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

তৃতীয় ভাগঃ মৌলিক অধিকার

২৬. মৌলিক অধিকারের সহিত অসামাঞ্জস্য আইন বাতিল, ২৭. আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২৮. ধর্ম,বণ,লিঙ্গ প্রভৃতি কারণের বৈষম্য, ২৯. সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, ৩০. বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, ৩১. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, ৩২. জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ, ৩৩. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, ৩৪. জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরন, ৩৫. বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষন, ৩৬. চলাফেরার স্বাধীনতার, ৩৭. সমাবেশের স্বাধীনতা, ৩৮. সংগঠনের স্বাধীনতা, ৩৯. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা, ৪০. পেশা বা বৃত্তির-স্বাধীনতা, ৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা, ৪২. সম্পত্তির অধিকার, ৪৩. গৃহ ও

যোগাযোগের সংরক্ষন, ৪৪. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ, ৪৫. শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন, ৪৬. দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা, ৪৭. কতিপয় আইনের হেফাজত, ৪৭ক. সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা

চতুর্থ ভাগঃ নির্বাহী বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ-রাষ্ট্রপতি ৪৮. রাষ্ট্রপতি, ৪৯. ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার, ৫০. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ, ৫১. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি, ৫২. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন, ৫৩. অসামর্থের কারনে রাষ্ট্রপতির অপসারন, ৫৪. অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার। ২য় পরিচ্ছেদ-প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা ৫৫. মন্ত্রীসভা, ৫৬. মন্ত্রিগণ, ৫৭. প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ, ৫৮. অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ তৃতীয় পরিচ্ছেদ-স্থানীয় শাসন ৫৯. স্থানীয় শাসন, ৬০ স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ৪র্থ পরিচ্ছেদ-প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ৬১. সর্বাধিনায়কতা, ৬২. প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি, ৬৩. যুদ্ধ ৫ম পরিচ্ছে-অ্যাটর্নি জেনারেল ৬৪. অ্যাটর্নি জেনারেল

পঞ্চম ভাগঃ আইনসভা

১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ ৬৫. সংসদ-প্রতিষ্ঠা, ৬৬. সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, ৬৭. সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া, ৬৮. সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি, ৬৯. শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড, ৭০. পদত্যাগ ইত্যাদি কারনে আসন শূন্য হওয়া, ৭১. দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা, ৭২. সংসদের অধিবেশন, ৭৩. সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী, ৭৩ক. সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার, ৭৪. স্পিকার ও ডেপুটি স্পকিার, ৭৫. কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি, ৭৬. সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ, ৭৭. ন্যায়পাল, ৭৮. সংসদ ও সস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি, ৭৯. সংসদ-সচিবালয় ২য় পরিচ্ছেদ-আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি ৮০. আইন প্রণয়-পদ্ধতি, ৮১. অর্থবিল, ৮২. আর্থিক ব্যবস্থাবলী সুপারিশ, ৮৩. সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা, ৮৪. সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সহকারী হিসাব, ৮৫. সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রন, ৮৬. প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ, ৮৭. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, ৮৮. সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়, ৮৯. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কে পদ্ধতি, ৯০. নির্দিষ্টকরণ আইন, ৯১. সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী, ৯২. হিসাব, ঋণ প্রভৃতির ভোট, ৯৩. [বিলুপ্ত] ৩য় পরিচ্ছেদ-অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা ৯৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

ষষ্ঠ ভাগঃ বিচার বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ-সুপ্রীম কোর্ট ৯৪. সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা, ৯৫. বিচারক নিয়োগ, ৯৬. বিচারকদের পদের মেয়াদ, ৯৭. অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ, ৯৮. সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ, ৯৯. বিচারকগণের অক্ষমতা, ১০০. সুপ্রীম কোর্টের আসন (১০) হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার, ১০২. কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা, ১০৩. আপিল বিভাগের এখতিয়ার, ১০৪. আপীল বিভার্গে পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ, ১০৫. আপিল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা, ১০৬. সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার, ১০৭. সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা, ১০৮. কোর্ট অর রেকর্ড রূপে সুপ্রীম কোর্ট, ১০৯. আদালত সমূহের উপর তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন, ১১০. অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগের মামলা স্থানান্তর, ১১১. সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা, ১১২. সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা, ১১৩. সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ ২য় পরিচ্ছেদ-অধস্তন ১১৪. অধ:স্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা, ১১৫. অধ:স্তন আদারতে নিয়োগ, ১১৬. অধ:স্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রন ও শৃঙ্খলা, ১১৬ক. বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ৩য় পরিচ্ছেদ-প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ১১৭. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমুহ ষষ্ঠ ভাগ : জাতীয় কল-[বিলুপ্ত]

সপ্তম ভাগঃ নির্বাচন

১১৮. নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, ১১৯. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ১২০. নির্বাচন কমিশনের কর্মচারগিণ, ১২১. প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা, ১২২. ভোটার-তালিকায় নামভুক্তি যোগ্যতা, ১২৩. নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়, ১২৪. নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা, ১২৫. নির্বাচনী আইন ও আইনের বৈধতা, ১২৬. নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান।

অষ্টম ভাগঃ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

১২৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা, ১২৮. মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব, ১২৯. মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ, ১৩০. অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক, ১৩১. প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি, ১৩২. সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ- কর্মবিভাগ ১৩৩. নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী, ১৩৪. কর্মের মেয়াদ, ১৩৫. অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের প্রভূতি, ১৩৬. কর্মবিভাগ পুনর্গঠন ২য় পরিচ্ছেদ-সরকারী কর্মকমিশন ১৩৭. কমিশন প্রতিষ্ঠা, ১৩৮. সদস্য নিয়োগ, ১৩৯. পদের মেয়াদ, ১৪০. কমিশনের দায়িত্ব, ১৪১. বার্ষিক রিপোর্ট

দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন

১৪২. সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা।

একাদশ ভাগ : বিবিধ

১৪৩ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি, ১৪৪. সম্পত্তি ও কারবার প্রভূতি সম্পর্কে নির্বাহী কর্তৃত্ব, ১৪৫. চুক্তি ও দলিল, ১৪৫ক. আন্তর্জাতিক চুক্তি, ১৪৬. বাংলাদেশের নামে মামলা, ১৪৭. কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভূতি, ১৪৮. পদের শপথ, ১৪৯. প্রচলিত আইনের হেফাজত, ১৫০. ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী, ১৫১. রহিতকরণ, ১৫২. ব্যাখ্যা, ১৫৩. প্রবর্তন, উল্লেখ, নির্ভরযোগ্য পাঠ

সংবিধান প্রণয়ন ও মুদ্রণের ইতিহাস

সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা হলেন ড. কামাল হোসেন (ঢাকা-৯, জাতীয় পরিষদ), মো. লুৎফর রহমান (রংপুর-৪, জাতীয় পরিষদ), অধ্যাপক আবু সাইয়িদ (পাবনা-৫, জাতীয় পরিষদ), এম আবদুর রহিম (দিনাজপুর-৭, প্রাদেশিক পরিষদ), এম আমীর-উল ইসলাম (কুষ্টিয়া-১, জাতীয় পরিষদ), মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মনজুর (বাকেরগঞ্জ-৩, জাতীয় পরিষদ), আবদুল মুনতাকীম চৌধুরী (সিলেট-৫, জাতীয় পরিষদ), ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র (বাকেরগঞ্জ-১৫, প্রাদেশিক পরিষদ), সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (সিলেট-২, প্রাদেশিক পরিষদ), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ময়মনসিংহ-১৭, জাতীয় পরিষদ), তাজউদ্দীন আহমদ (ঢাকা-৫, জাতীয় পরিষদ), খন্দকার মোশতাক আহমেদ (কুমিল্লা-৮, জাতীয় পরিষদ), এ এইচ এম কামরুজ্জামান (রাজশাহী-৬, জাতীয় পরিষদ), আবদুল মমিন তালুকদার (পাবনা-৩, জাতীয় পরিষদ), আবদুর রউফ (রংপুর-১১, ডোমার, জাতীয় পরিষদ), মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ (রাজশাহী-৩, জাতীয় পরিষদ), বাদল রশীদ, বার অ্যাট ল, খন্দকার আবদুল হাফিজ (যশোর-৭, জাতীয় পরিষদ), শওকত আলী খান (টাঙ্গাইল-২, জাতীয় পরিষদ), মো. হুমায়ুন খালিদ, আছাদুজ্জামান খান (যশোর-১০, প্রাদেশিক পরিষদ), এ কে মোশাররফ হোসেন আখন্দ (ময়মনসিংহ-৬, জাতীয়

পরিষদ), আবদুল মমিন, শামসুদ্দিন মোল্লা (ফরিদপুর-৪, জাতীয় পরিষদ), শেখ আবদুর রহমান (খুলনা-২, প্রাদেশিক পরিষদ), ফকির সাহাব উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক খোরশেদ আলম (কুমিল্লা-৫, জাতীয় পরিষদ), অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক (কুমিল্লা-৪, জাতীয় পরিষদ), দেওয়ান আবু আব্বাছ (কুমিল্লা-৫, জাতীয় পরিষদ), হাফেজ হাবিবুর রহমান (কুমিল্লা-১২, জাতীয় পরিষদ), আবদুর রশিদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী (চট্টগ্রাম-৬, জাতীয় পরিষদ), মোহাম্মদ খালেদ (চট্টগ্রাম-৫, জাতীয় পরিষদ) ও বেগম রাজিয়া বানু (নারী আসন, জাতীয় পরিষদ)।

একই বছরের ১৭ই এপ্রিল থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত এই কমিটি বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক করে। জনগণের মতামত সংগ্রহের জন্য মতামত আহবান করা হয়। সংগ্রহীত মতামত থেকে ৯৮টি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। ১২ই অক্টোবর, ১৯৭২ তারিখে তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সংবিধান বিল গণপরিষদে উত্থাপন করেন। এরপর ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ সালে বিলটি পাস হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

সংবিধান লেখার পর এর বাংলা ভাষারূপ পর্যালোচনার জন্য ড. আনিসুজ্জামানকে আহবায়ক, সৈয়দ আলী আহসান এবং মযহারুল ইসলামকে ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে একটি কমিটি গঠন করে পর্যালোচনার ভার দেয়া হয়। গণপরিষদ ভবন, যা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন, সেখানে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বৈঠকে সহযোগিতা করেন ব্রিটিশ আইনসভার খসড়া আইন-প্রণেতা আই গাথরি। সংবিধান ছাপাতে ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিলো। শিল্পী হাশেম খান অলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তৈরী ক্র্যাবটি ব্রান্ডের দুটি অফসেট মেশিনে সংবিধানটি ছাপা হয়। মূল সংবিধানের কপিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

বাংলাদেশের সংবিধান .....

বাংলাদেশের গণপরিষদে আদেশ কবে জারি করা হয়?

>রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩মার্চ তারিখে বাংলাদেশের ণপরিষদ আদেশ জারি করেন।এ আদেশ ২৬ মার্চ '৭১থেকে কার্যকরী বলে ঘোষিত হয়।১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ এবং ১৯৭১ সালের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সম্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, কার্যকরী হয়। এ সংবিধান ১টি প্রস্তাবনা,৪টি তফসিল ও ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সমগ্র সংবিধান ১১টি ভাগে বিভক্ত।

বাংলাদেশের সংবিধান কিভাবে রচিত হয়?

সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৩৪সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠিত হয়। ড. কামাল হোসেন ছিলেন এ কমিটির প্রধান। ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল কমিটির প্রথম বৈঠকে সংবিধান সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন সংগঠন এবং আগ্রহী ব্যক্তিগনের নিকট হতে প্রস্তাব আহবানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।বিভিন্ন মহল থেকে পাঠানো ৯৮টি প্রস্তাব সংবিধান কমিটি যথাযথ মূল্যায়নের পর ১০জুন বিলের আকার সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন।

খসড়াকে ত্রুটিমুক্ত ও নিখুত করার জন্য ভারত ও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ নাগরিকের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহন করা হয়। ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া

সংবিধান উত্থাপিত হয়। এরপর এতে ৬৫টি সংশোধনী যুক্ত হয় এবং ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান বলবৎ করা হয়। (১৫তম ও ২০তম বিসিএস)

বাংলাদেশের সংবিধানে সংবিধান সংশোধনের কি বিধান রাখা হয়েছে?

- বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে একে সংশোধন করা যায় না। সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। তবে সংবিধানের প্রস্তাবনা বা সংবিধানের ৮,৪৮,৫৬,৫৮,৮০,৯২(ক) বা ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য কেবল সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনই যথেষ্ট নয়। উক্ত অনুচ্ছেদগুলো সংশোধন করতে হলে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

সংবিধানে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান এবং এর স্থায়িত সম্পর্কে কি বিধান রয়েছে?

- রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রতি বছর কমপক্ষে দুটি অধিবেশন বসবে। সংসদ নির্বাচনের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। সংসদের কার্যকাল ৫ বছর। তবে প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে সংসদের আইন দ্বারা এর মেয়াদ এক বছর বাড়ানো যেতে পারে। কমপক্ষে ৬০জন সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হয়। (২১তম বিসিএস)

কমনওয়েলথ অব নেশনস

কমনওয়েলথ অব নেশনস হলো স্বাধীন জাতিসমূহ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **কমনওয়েলথ অব নেশন্স** গঠিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৫৪। ১৯৩১ সালে ওয়েস্টমিনিস্টার সংবিধি বলে গ্রেট ব্রিটেন, আইরিশ ফ্রি স্টেট (বর্তমানে আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র), কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গঠিত হয় । কমনওয়েলভূক্ত সরকার প্রধানদের সরাসরি ভোট এর মহাসচিব নির্বাচিত হন।

সদস্য-দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলি আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রতি দু বছর অন্তর কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কমনওয়েলথের সকল সভা লন্ডনেই অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু পরে সরকার প্রধানদের সভা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বাগতিক দেশের সরকার প্রধান ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সরকার প্রধানদের সভা থেকে যেসব ঘোষণা ও বিবৃতি প্রদান করা হয়, সদস্য-দেশগুলো তা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথে যোগ দেয়। কমনওয়েলথের অধিকাংশ সদস্য-দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়েছিল। কমনওয়েলথে যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশ বরাবরই কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ক আলোচনায়

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে কানাডার অটোয়াতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো যোগদান করে।

বর্তমানে কমনওয়েলথের সদস্য-দেশ হলো: অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামা, বাংলাদেশ, বার্বাদোস, বেলিজ, বোৎসোয়ানা, ব্রুনেই দারুসসালাম, ক্যামেরুন, কানাডা, সাইপ্রাস, ডোমিনিকা, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, গাম্বিয়া, ঘানা, গ্রানাডা, গায়ানা, ভারত, জ্যামাইকা, কেনিয়া, কিরিবাতি, লেসোথো, মালাভি, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মাল্টা, মরিশাস, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নাউরু, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সিচিলেস, সিয়েরা লিওন, সিঙ্গাপুর, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস, সোয়াজিল্যান্ড, তানজানিয়া, টোঙ্গা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, টুভালু, উগান্ডা, যুক্তরাজ্য, ভানুয়াতু, পশ্চিম সামোয়া, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে।

তথ সুত্রঃ বাংলাপিডিয়া

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC)

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সংক্ষেপে সার্ক SAARC) দক্ষিণ এশিয়ার একটি সরকারি সংস্থা। এর সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং আফগানিস্তান। গণচীন ও জাপানকে সার্কের পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সার্ক ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যখন বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান নেপাল ভুটান মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা নেতারা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক,অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা করার লক্ষে এক রাজোকীয় সনদপত্রে আবদ্ধ হন । এটি অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নের যৌথ আত্মনির্ভরশীলতা জোর নিবেদিত । সার্কের প্রতিষ্টাতা সদস্য সমূহ হল বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান এবং ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্ককের সদস্য পদ লাভ করে । রাষ্ট্রের শীর্ষ মিটিং সাধারণত বাত্সরিক নির্ধারিত এবং পররাষ্ট্র সচিবদের সভা দুই বছ পর পর অনুষ্টিত হয় । নেপালের কাঠমান্ডুতে সার্কের সদর দফতর অবস্থিত ।

প্রথম দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা থেকে আসে । সার্ক সচিবালয় জানুয়ারী ১৬, ১৯৮৭ সালে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নেপালের প্রথিতযশা রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব এটি উদ্বোধন করেন।

সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ:

কেন্দ্রর নাম	**সংক্ষিপ্ত নাম**	**অবস্থান**
সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	এসসিসি	শ্রীলঙ্কা
সার্ক উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	এসসিজেডএমসি	মালদ্বীপ

কেন্দ্রর নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	অবস্থান
সার্ক বন গবেষণা কেন্দ্র	এসএফসি	ভুটান
সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র	এডিএমসি	ভারত
সার্ক শক্তি কেন্দ্র	এসইসি	পাকিস্তান
সার্ক তথ্য কেন্দ্র	এসআইসি	নেপাল
সার্ক নথিপত্রকরণ কেন্দ্র	এসডিসি	নয়া দিল্লি, ভারত
সার্ক কৃষিবিষয়ক কেন্দ্র	এসএসি	ঢাকা, বাংলাদেশ
সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র	এসএমআরসি	ঢাকা, বাংলাদেশ
সার্ক যক্ষ্মা ও এইচআইভি/এইডস কেন্দ্র	এসটিএসি	কাঠমুন্ডু, নেপাল
সার্ক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	এসএইচআরডিসি	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

সার্ক মহাসচিবদের তালিকা:

রমিক নং	দেশ	নাম	সময়কাল
১	বাংলাদেশ	আবুল আহসান	১৬ জানুয়ারি, ১৯৮৫ – ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৯
২	ভারত	কান্ত কিশোর ভার্গব	১৭ অক্টোবর, ১৯৮৯ – ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১
৩	মালদ্বীপ	ইব্রাহীম হুসাইন জাকী	১ জানুয়ারি, ১৯৯২ – ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩
৪	নেপাল	যাদব কান্ত সিলওয়াল	১ জানুয়ারি, ১৯৯৪ – ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

৫	পাকিস্তান	নাঈম ইউ. হাসান	১ জানুয়ারি, ১৯৯৬ – ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮
৬	শ্রীলঙ্কা	নিহাল রডরিগো	১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ – ১০ জানুয়ারি, ২০০২
৭	বাংলাদেশ	কিউ. এ. এম. এ. রহিম	১১ জানুয়ারি, ২০০২ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫
৮	ভূটান	লিয়নপো চেনকিয়াব দর্জি	১ মার্চ, ২০০৫ –২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮
৯	ভারত	শীল কান্ত শর্মা	১ মার্চ, ২০০৮ – ২৮, ফেব্রুয়ারি, ২০১১
১০	মালদ্বীপ	ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ	১ মার্চ, ২০১১ – ১১ মার্চ, ২০১২
১১	মালদ্বীপ	আহমেদ সেলিম	১২ মার্চ, ২০১২ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
১২	নেপাল	অর্জুন বাহাদুর থাপা	১ মার্চ ২০১৪ (বর্তমান)

তথ্যসূত্র:https://bn.wikipedia.org/wiki

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) জাতিসংঘের একটি সহযোগী সংস্থা বা এজেন্সী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

সংস্থার প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মহাপরিচালক যিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বর্তমান মহাপরিচালক হিসেবে রয়েছেন হংকংয়ের অধিবাসী মার্গারেট চ্যান। তিনি ৯ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখে নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য প্রার্থী হন। মে, ২০১২ তারিখে ড. চ্যান বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের মাধ্যমে জুন, ২০১৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

তথ্যসূত্র: https://bn.wikipedia.org

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) (International Atomic Energy Agency (IAEA)) বিশ্বে পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং সামরিক উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার রোধকল্পে কাজ করে থাকে। এই সংস্থাটি ১৯৫৭ সালের ২৯ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত। যদিও জাতিসংঘের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে সংস্থাটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ – উভয় পরিষদেই এটি এর কার্যক্রম পেশ করে।

আইএইএ-এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে অবস্থিত। এর দুইটি আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে, এর একটি কানাডার টরন্টোতে এবং অন্যটি জাপানের টোকিওতে। এছাড়া নিউ ইয়র্ক এবং জেনেভাতে দুইটী মৈত্রী অফিস রয়েছে। আইএইএ তিনটি ল্যাবরেটরিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে; এগুলো ভিয়েনা, সাইবার্সডোর্ফ এবং মোনাকোতে অবস্থিত।

আইএইএ একটি আন্তসরকার ফোরাম হিসেবে কাজ করে। এখানে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, কারিগরী গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়। আইএইএ-এর কার্যসূচীর উদ্দেশ্য হল বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা ও পারমাণবিক প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ। এছাড়া পারমাণবিক নিরাপত্তা এবং পারমাণবিক নিরাপত্তাবিষয়ক বিভিন্ন মানদণ্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করাও আইএইএ-এর উদ্দেশ্য।

৭ অক্টোবর, ২০০৫ তারিখে আইএইএ এবং এর সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ এল বারাদি যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। বর্তমান মহাপরিচালক হিসেবে রয়েছেন জাপানের অধিবাসী ইউকিয়া আমানো।

মহাপরিচালকদের তালিকা

নাম	জাতীয়তা	কার্যকাল

ডব্লিউ স্টার্লি কোল	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯৫৭-১৯৬১
সিগভার্ড একল্যান্ড	সুইডেন	১৯৬১–১৯৮১
হ্যান্স ব্লিক্স	সুইডেন	১৯৮১–১৯৯৭
মোহাম্মদ এল বারাদি	মিশর	১৯৯৭-২০০০
শামীম ওসমান	বাংলাদেশ	২০০০-২০০৯
ইউকিয়া আমানো	জাপান	ডিসেম্বর ২০০৯-বর্তমান

তথ্যসূত্র : https://bn.wikipedia.org

লিগ অব নেশনস

লিগ অব নেশনস (League of Nations) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী একটি আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারী সংস্থা। ১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি আলোচনার ফলস্বরূপ এ সংস্থাটির জন্ম। পৃথিবীতে বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় সর্বপ্রথম সংস্থাটি হল লিগ অব নেশনস। সংস্থাটির কভেন্যান্ট অনুযায়ী এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সম্মিলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অসামরিকীকরণের মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ানো এবং সমঝোতা ও শালিসের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের নিরসন করা। অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, আদিবাসীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, বৈশ্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, মাদক ও মানব পাচার রোধ, অস্ত্র কেনাবেচা রোধ এবং ইউরোপের সংখ্যালঘু ও যুদ্ধবন্দীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ অন্যতম। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫-এর মধ্যে সংস্থাটির সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা ছিল ৫৮টি।

বহু বছরের কূটনৈতিক শৃঙ্খল ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক কূটনৈতিক সম্পর্কের একটি ধারনার ফসল ছিল লিগ অব নেশনস। সংস্থাটির অধীনে কোন আলাদা সৈন্যবাহিনী ছিল না। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন, সংশোধন ও সংস্কার, অন্য দেশের ওপর অর্থনৈতিক শাস্তি আরোপ বা প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগের বেলায় সংস্থাটি পুরোপুরি বৃহৎ শক্তিবর্গের ওপর নির্ভরশীল থাকত। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গও বিভিন্ন প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। শাস্তিপ্রয়োগ বা অবরোধ আরোপ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আহত করতে পারে ভেবে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে সংস্থাটি। ইতালো-আবিসিনিয়ান যুদ্ধের সময় লিগ অব নেশনস অভিযোগ করে যে ইতালীয় সৈন্যরা রেড ক্রসের মেডিকেল তাঁবুগুলোতে আক্রমণ চালিয়েছে। প্রত্যুত্তরে বেনিতো মুসোলিনি বলেছিলেন "চড়ুই যখন চিৎকার-চেঁচামেচি করে তখন জাতিপুঞ্জ সরব হয়, কিন্তু ঈগল আহত হলে চুপ করে বসে থাকে।"

অল্প কিছু সাফল্য এবং শুরুর দিকে বেশ কয়েকটি ব্যর্থতার পর অবশেষে ত্রিশের দশকে লিগ অব নেশনস অক্ষশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হয়। জার্মানির সাথে সাথে জাপান, ইতালি, স্পেন ও অন্যান্য দেশ সংস্থাটি থেকে সরে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি মাত্র ২৭ বছর টিকে ছিল। বর্তমান জাতিসংঘ বিশ্বযুদ্ধের পরে এর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সংস্থাটির একাধিক সহযোগী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

তথ্যসূত্র : https://bn.wikipedia.org/wiki/

৩১। চর্যাপদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য কি কি?
উঃ ক. ছন্দ ছিল
খ. স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার ছিল।
গ. পদের ক্ষেত্রে লিঙ্গের (পুরুষ ও স্ত্রী)ব্যবহৃত ছিল।
ঘ. শ,স,ষ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।মুলত 'স' ব্যবহার হত।
ঙ. প্রবাদের প্রচলন ছিল।
৩২। চর্যাপদের কবিদের নামের শেষের(পাদ্নাম)কেন সংযুক্ত থাকত?
উঃ ঈশ্বরের সেবাদাস বা পদসেবক অর্থে 'পাদ্নাম' ব্যবহার করা হয়েছে-যা সম্মান নির্দেশক।
৩৩। চর্যাপদের কবিগণ কে,কোন অঞ্চলের?
উঃ লুই,কুক্করী পা,বিরুআ পা,ডোম্বী পা, ধাম পা,প্রমুখ তারাঁ বাংলাদেশের।দারিক পা,কাহ্ন পা, কম্বলাম্বর,বর পা, প্রমুখ উড়িষ্যা, মহীধর-মগধের,ভাদে পা- মহীভদ্রের,সরহ-উত্তরবঙ্গের।
৩৪। চর্যাপদের নায়ক-নায়িকা কি নামে অভিহিত করা হয়েছে?
উঃ নায়ক->সবর,কাপালিক,যোগী।
নায়িকা->ডোম্বী, যোগিনী,নৈরামণি,সবরী,চন্ডালী।
৩৫। মূল চর্যা সংকলন গ্রন্থের নাম কি?
উঃ চর্যাগীতি কোষ।
৩৬।'চর্যাপদ' শব্দটির অর্থ কি?
উঃ জীবন যাপনের পদ্ধতিকে চর্যা বলে।'চর্যা' থেকে বর্তমানে 'চর্চা' শব্দটির উৎপত্তি।'পদ' অর্থ চরণ বা পা।'চর্যাপদ' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়'জীবন যাপনের পদ্ধতি বা আচরণ যে কবিতায় বা চরণে লিখিত থাকে'।
৩৭। চর্যাপদের সর্বশেষ পদকর্তার নামকি? এবং তাঁর পদের নম্বর কত?
উঃ'সরহ পা' ৫০ নং পদ।

৩৮। তিব্বতী অনুবাদকের নাম কি?

উঃ কীর্তিচন্দ্র।

৩৯। তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সংবাদ প্রদানকারী কে?

উঃ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪০। তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সংগ্রাহক কে?

উঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী।

চর্যাগীতি

চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বাঞ্চলীয় উপশাখার (পূর্বাঞ্চলীয় আর্য ভাষা) অন্তর্গত, বাংলা-অহমিয়া ভাষা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা হিসেব বিবেচিত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাকৃতজনের ভাষার সাথে আর্যদের ভাষা মিশ্রিত হয়ে বাংলা স্বতন্ত্র ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করার সময়, বাংলা ভাষার আদি রূপ ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করছিল, তারই একমাত্র নমুনা হিসেবে চর্যাগীতিকে আদর্শ বিবেচনা করা হয়। এই ভাষার কাঠামো চের্যাগীতির আদলে প্রকাশ পেয়েছিল খ্রিষ্টীয় ৫০০-৬০০ অব্দের দিকে।

১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুথির একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটির নাম ছিল- *Sanskrit Buddhist Literature in Nepal*। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (২৬.৭.১৮৯১) মৃত্যুর পর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যা অঞ্চলের পুথি সংগ্রহের দায়িত্ব দেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র উপর। এই সূত্রে তিনি ১৯০৭ সালে নেপালে যান (তৃতীয় অনুসন্ধান-ভ্রমণ)। এই ভ্রমণের সময় তিনি নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে কিছু নতুন পুথির সন্ধান পান। এই পুথিগুলোসহ *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*- নামেএকটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ)। এই সংকলনের একটি গ্রন্থ ছিল *চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চিয়*।

গ্রন্থনাম : ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নেপালে প্রাপ্ত তালপাতার পুথি সম্পর্কে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকার নাম ছিলো- *A Catalogue of Palm Leaf and selected Paper MSS belonging to the Durbar Library, Nepal*। এর দ্বিতীয় খণ্ডের তালিকায় এই পুথির নাম হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন -*চর্য্যাচর্য্যটীকা*। এই নামটি পুথির মলাটে লিখা ছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা*- নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন-*চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চিয়*। কেন তিনি গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করেছিলেন তার ব্যাখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেন নি।

এই পুথির বন্দনা শ্লোকে আছে-
'শ্রীলূয়ীচরণাদিতিসিদ্ধরচিতেহপ্যাশ্চর্য্যাচেয়সদ্বার্ত্মাবগমায়নির্মলগিরাং.....। এই শ্লোকে উল্লিখিত 'আশ্চার্য্যচর্য্যাচয়' শব্দটিকে এই গ্রন্থের নাম হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রবোধকুমার বাগচী এবং সুকুমার সেন এর যথার্থ নাম হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন- *চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়*। এই গ্রন্থের মনুদত্তের তিব্বতী অনুবাদ অনুসরণে এই পুথির নাম *চর্যাগীতিকোষবৃত্তি* নামকরণের প্রস্তাব করেছেন। নামকরণের এই বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে এই পুথি সাধারণভাবে চর্যাগীতি বা চর্যাগীতিকা নামেই পরিচিত।

রচনাকাল : বিভিন্ন গবেষকগণ এই পুথির পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য কিছু মত দেওয়া হলো। যেমন–

- **সুনীতি চট্টোপাধ্যায় :** খ্রিষ্টীয় ৯০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে রচিত "চর্য্যাপদ" নামে পরিচিত কতকগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানে আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। [*ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। রূপা। বৈশাখ ১৩৯৬]

- **সুকুমার সেন :** বাঙ্গালা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম হইতে মধ্য-চতুর্দশ শতাব্দ (৯০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক বইটির প্রথম গ্রন্থ "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" অংশে সঙ্কলিত চর্যাগীতিগুলি আদি স্তরের অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইলেও এগুলির ভাষা খাঁটি আদি স্তরের বাঙ্গালা নহে। [*ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। নভেম্বর ১৯৯৪]

- **ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ :** আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। নাথ-গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধযুগে। কিন্তু আমরা তাহা পাই নাই। আমরা বৌদ্ধযুগের একটি মাত্র বাঙ্গালা পুস্তক পাইয়াছি। ইহার নাম আশ্চর্যচর্যাচয়। [*বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স। জুলাই ১৯৯৮]

চর্যাগীতির পদসংখ্যা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে পূর্ণাঙ্গ পদ পাওয়া গেছে ৪৬টি। এই গ্রন্থের ২৩ সংখ্যক পদের অর্ধাংশ পাওয়া গিয়েছিল। বাকি ৩টি পদ (২৪, ২৫ ও ৪৮) ছিল না। ২৩ সংখ্যক পদের শেষাংশ এবং না-পাওয়া ৩টি পদ তিব্বতী অনুবাদ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন প্রবোধকুমার বাগচী। সব মিলিয়ে চর্যাগীতির পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০টি।

চর্যাগীতির পদকর্তাগণ

এই পদগুলো রচনা করেছিলেন মোট ২৪ জন সিদ্ধাচার্য। এঁরা হলেন: লুইপাদানাম, কুক্কুরীপাদানাম, বিরুবাপাদানাম্, গুন্ডরীপাদানাম্,চাটিল্লপাদানাম্, ভুসূকুপাদানাম্, কাহ্নপাদানাম্, কম্বলাম্বরপাদানাম্, ডোম্বীপাদানাম, শান্তিপাদানাম্, মহিত্তাপাদানাম্, বীণাপাদানাম্ ,সরহপাদানাম্, শবরপাদানাম্, আর্যদেবপাদানাম্ , ঢেন্ঢণপাদানাম্, দারিকপাদানাম্, ভাদেপাদানাম্, তাড়কপাদানাম্, কঙ্কনাপাদানাম্,জয়নন্দীপাদানাম্, ধর্ম্মাপাদানাম্, তান্তী পা, লাড়ীডোম্বী। এঁদের মধ্যে লাড়ীডোম্বীর পদটি পাওয়া যায়নি। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদগুলি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকলেও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদে এগুলির রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়েছে যথাক্রমে কাহ্ন, তান্তী পা ও কুক্কুরী।

অধিকাংশ গবেষক চর্যা-পদকর্তাদের ভিতরে লুইপাদানামকে আদিসিদ্ধাচার্য হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন। অবশ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন আদিসিদ্ধাচার্য হিসাবে সরহপাদ-কে বিবেচনা করেছেন। ইনি ঠিক কোন সময়ের কবি ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ১ ও ২৯ সংখ্যক পদদুটি তাঁর রচিত।

চর্যার পুঁথিতে সর্বাধিক সংখ্যক পদের রচয়িতা কাহ্নপাদানাম্। তিনি কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণপাদ ও কৃষ্ণবজ্র নামেও পরিচিত। পুঁথিতে তাঁর মোট ১১টি পদ (৭, ৯, ১১, ১২, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫) পাওয়া যায়। ভুসূকুপাদানাম্ রচিত পদের সংখ্যা আটটি (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯)।এছাড়া সরহপাদানাম্-এর চারটি পদ (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯), কুক্কুরীপাদানাম-এর তিনটি পদ (২, ২০, ৪৮), শান্তিপাদানাম্-এর ২টি পদ (১৫ ও ২৬), শবরপাদানাম্-এর দুইটি পদ (২৮ ও ৫০) রচনা করেন। এ ছাড়া একটি করে পদ রচনা করেন বিরুবাপাদানাম্ (৩), গুন্ডরীপাদানাম্ (৪), চাটিল্লপাদানাম্ (৫), কম্বলাম্বরপাদানাম্ (৮), ডোম্বীপাদানাম(পদ ১৪), মহিত্তাপাদানাম্ (১৬), বীণাপাদানাম্ (১৭), আর্যদেবপাদানাম্ (৩১), ঢেন্ঢণপাদানাম্ (৩৩), রিকপাদানাম্ (৩৪), ভাদেপাদানাম্ (৩৫), তাড়কপাদানাম্ (৩৭), কঙ্কনাপাদানাম্ (৪৪), জয়নন্দীপাদানাম্(৪৬), ধর্ম্মাপাদানাম্ (পদ ৪৭) ও তান্তী পা (২৫, মূল বিলুপ্ত)। নাড়ীডোম্বীপাদের পদটি পাওয়া যায় না।

চর্যাগীতির ভাষা

চর্যাপদের সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার পর এর ভাষা নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষাবাষীরা তাদের নিজ ভাষার প্রাচীনতম নমুনা হিসেবে দাবি করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোহা* গ্রন্থের ভূমিকায় চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং ডাকার্ণব-কে সম্পূর্ণ প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে দাবি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভও তাঁর দাবিকে সমর্থন করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যাগীতিকে বাংলার প্রাচীন নমুনা হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাগান ও দোহাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশ্লেষণ করে– তাঁর *The Origin and Development of the Bengali*

Language গ্রন্থে, এইগুলিকেই প্রাচীন বাংলার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় *Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha* গ্রন্থে সুনীতিকুমারের মত গ্রহণ করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বা অন্যান্য ভাষার বিদ্বজ্জনেরা যাঁরা চর্যাকে নিজ নিজ ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে দাবি করেছিলেন, তাঁরা এই রকম সুস্পষ্ট ও সুসংহত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি।

সন্ধ্যাভাষা

চর্যাপদগুলোর ভিতরে রয়েছে নানা ধরনের দুর্বোধ্য ভাব। এর আক্ষরিক অর্থের সাথে ভাবগত অর্থের ব্যাপক ব্যবধান আছে। ফলে এই পদগুলোতে বুঝা-না-বুঝার দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেই কারণে চর্যায় ব্যবহৃত ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা। তাঁর মতে-

'সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিকটা বুঝা যায় না। অর্থাৎ, এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।'

বজ্রযানী ও সহজযানী গ্রন্থকাররাও একে 'সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্' বলে এক রহস্যের ইঙ্গিত দিতেন। বজ্রযানী গ্রন্থগুলিতে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। তিব্বতি ভাষায় 'সন্ধ্যাভাষা'র অর্থ 'প্রহেলিকাচ্ছলে উক্ত দুরুহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা'। ম্যাক্সমুলার 'সন্ধ্যা'র অর্থ করেছিলেন 'প্রচ্ছন্ন উক্তি' (hidden saying)।

চর্যাগীতির সাঙ্গিতিক বৈশিষ্ট্য

চর্যাপদগুলো একাধিক চরণবিশিষ্ট, অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা এবং সুরসঙ্গের বিচারে গীত। চর্যারপদগুলিতে রাগনামের উল্লেখ রয়েছে। রাগনাম থেকেই সহজেই বলা যায়, এগুলো সুরসহযোগে পরিবেশিত হতো। নিচে রাগানুসারে গানগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।

- **পটমঞ্জরী :** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই রাগের গান সংখ্যা ১১টি গান। তাতে ৪৮ সংখ্যক গানটি ছিল না। তিব্বতী অনুবাদ অনুসার ৪৮ সংখ্যক গানটির শিরোনামে 'পটমঞ্জরী' রাগের নাম পাওয়া যায়। এই হিসাবে এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি। এই গানগুলো হলো– ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ ও ৪৮।
- **মল্লারী :** এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৫টি। এই গানগুলো হলো– ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫ ও ৪৯।
- **ভৈরবী :** এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৪টি। এই গানগুলো হলো–১২, ১৬, ১৯ ও ৩৮।
- **কামোদ :** এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৪টি। এই গানগুলো হলো– ১৩, ২৭, ৩৭ ও ৪২।

- **বরাড়ী :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে বলাড্ডী ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৩টি। এই গানগুলো হলো– ২১, ২৩, ২৮ ও ৩৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই ২৩ সংখ্যক গানের শেষাংশ ছিল না।
- **গুঞ্জরী :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে গুর্জরী বা কাহ্ন-গুর্জরী ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৪টি। এই গানগুলো হলো– ৫, ২২, ৪১ ও ৪৭।
- **গৌড় :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে গবড়া বা গউড়া উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৩টি। এই গানগুলো হলো– ২, ৩, ১৮।
- **দেশাখ :** চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে দ্বেশাখ উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো– ১০ ও ৩২।
- **রামকেলি** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে রামক্রী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো– ১৫ ও ৫০।
- **আশাবরী** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে শিবরী বা শবরী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো– ২৬ ও ৪৬।
- **মালসী** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপরাপর নাম হিসেবে মালসী গবুড়া উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ২টি। এই গানগুলো হলো–৩৯ ও ৪০।
- **অরু**: এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ৪
- **দেবগিরি** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে দেবক্রী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ৮
- **ধানশী** : চর্যাগীতিতে এই রাগের অপর নাম হিসেবে ধনসী উল্লেখ আছে। এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ১৪।
- **বঙ্গাল** : এই রাগে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ১টি। এই গানটি হলো – ৩৩।

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই ২৩ সংখ্যক গানের শেষাংশ ছিল না। তিব্বতী নমুনা থেকে এই পদের রচয়িতা হিসেবে তান্তীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে রাগের নাম নেই। একইভাবে

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক উদ্ধারকৃত গ্রন্থে এই ২৪ সংখ্যক গান ছিল না। তিব্বতী নমুনায় এই রাগের সাথে ইন্দ্রতাল উল্লেখ আছে। সুকুমার সেন এই রাগটিকে 'তাল' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উপরের তালিকা অনুসারে- চর্যাপদগুলোরে সাথে মোট ১৫টি রাগের নাম পাওয়া যায়।

সূত্র :

- *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩২৩
- *চর্যাগীতি পদাবলী*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫
- *Materials for a Critical Edition of the Old Bengali Charyapadas* (A comparative study of the text and the Tibetan translation), Part I, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, Journal of the Department of Letters, Vol. XXX, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৮
- *Development of the Bengali Language* .Suniti Kumar Chatterji. London. George Allen & Unwin Ltd, 1970
- *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মাওলা ব্রাদ্রাস। ঢাকা। জুলাই ১৯৯৮।
- *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা। কলকাতা ২০০১।
- *চর্যাগীতিকা*। সম্পাদনায় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা। স্টুডেন্ট ওয়েজ। অগ্রহায়ণ ১৪০২।
- *চর্যাগীতি পাঠ*। ড. মাহবুবুল হক। পাঞ্জেরী পাবলিকেশান লি.। ঢাকা। জুলাই ২০০৯।
- চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ সংস্করণ। জানুয়ারি ২০০৫।
- চর্যাগীতিকোষ। নীলরতন সেন সম্পাদিত। সাহিত্যলোক। কলকাতা। জানুয়ারি ২০০১।

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com